আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্ট ষষ্টিতম গ্রন্থ

মাতৃহীন

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

আশ্বিন—১৩৩৩

প্রকাশক—

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়।

বুধোদয় প্রেস্

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতৃহীন

১

এটর্ণি হেমেন্দ্রনাথের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। বাড়ীর চারিদিকে খোলা জমি—সম্মুখে ও পশ্চাতে সুদৃশ্য উদ্যান। গেট্ পর্য্যন্ত কাঁকরফেলা প্রশস্ত রাস্তা—রাস্তার দুইধারে পত্রশোভা অনতি-উচ্চ ক্রোটনের সারি। দক্ষিণ দিকে, কিছু দূরে, বাগানের ভিতরেই ছোটখাট একতল দ্বিতল কয়েকখানি ঘর; এইগুলি বাগানের মালী, দ্বারবান্ এবং চাকরবাকরদের থাকিবার গৃহ। বাড়ীখানির ভিতরের যেটুকু অংশ দেখা যাইত, তাহার মূল্যবান্ সজ্জাদি দর্শনে পথিকের মনে গৃহস্বামীর ধনশালীতার সম্বন্ধে সংশয় থাকিত না।

বেলা প্রায় পাঁচটা। মাথার উপর আকাশ কোথাও পরিষ্কার নীল—কোথাও লঘু মেঘখণ্ড রৌদ্ররঞ্জিত; আকাশের গায়ে পাখীর দল সার বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। বাগানের উড়িয়া মালী দুইজন গাছে জল দেওয়া, গোলাপ-গাছের শুষ্ক পাতা বাছিয়া ফেলা, এবং সিঁড়ির ধারের টবের গাছগুলার মাটী উস্কাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইতেছিল। বাড়ীখানি একেবারেই

নীরব। গেটের ধারে যে দ্বারবান্ বসিয়াছিল, গেট্ খুলিয়া দেওয়া ও বন্ধ করাই যেন তাহার জীবনের একমাত্র কাজ; কলের মতই সে ঐ কাজটি করিয়া যাইত! বাড়ীর চাকরবাকরেরা কাজ করিত, চলাফেরা করিত, কিন্তু সবই যেন সংযতভাবে;—পাছে গৃহস্বামীর শান্তি ভঙ্গ হয়, এমনই একটা সতর্কতা যেন সকলের মনেই জাগ্রত ছিল।

বাগানের ভিতর, চাকরদের ঘরের অদূরে, রাধানাথ দ্বারবানের ঘর। রাধানাথ ভদ্রঘরের ছেলে, বাঙ্গালী, শৈশবে লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছিল; কিন্তু অল্পবয়সে সিদ্ধি ও গঞ্জিকা সেবায় অভ্যস্ত হওয়ায় মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। লক্ষ্মীর উপাসনায় রাধানাথের আপত্তি ছিল না, বরং প্রয়োজনই ছিল; কিন্তু ব্যায়ামপুষ্ট সবল দেহ ছাড়া তাহার এমন কোন গুণ ছিল না যাহাতে পেচকবাহিনী চঞ্চলা দেবীটির প্রসন্নতা সে আকর্ষণ করিতে পারে। বাটীতে রাধানাথের বৃদ্ধা মাতা এবং ভগিনী মঞ্জরী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। মা বৃদ্ধা, তাহার উপর বারমাসই রুগ্না; ভগিনীরও বিবাহের বয়স হইয়াছে, রাধানাথ অন্য উপায় না দেখিয়া গঞ্জিকা ও সিদ্ধির মাত্রা বাড়াইয়া দিল। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিন কার্য্যেই বিধাতার হস্ত—এই চিরপ্রচলিত বাক্যের সম্মান দেখাইতেই যেন রাধানাথের সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের মধ্যেও মঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গেল! বর পশ্চিমে রাণীগঞ্জে কয়লার খনিতে সামান্য সরকারের কাজ করিত; তাহার তিন কুলে কেহ

ছিল না। দ্বাদশবর্ষীয়া মঞ্জরী বিবাহের পর একেবারে গৃহিণীর পদগ্রহণ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল। রাধানাথের শূন্যগৃহ একেবারেই শূন্য হইয়া গেল। রুগ্না মাতার সেবা হয় না—নিজেও ক্ষুধায় অন্ন পায় না। শেষে মায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বাড়ী বাঁধা রাখিয়া, গৃহহীন রাধানাথ শূন্য-ভাণ্ডারে গৃহলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিল। রাধানাথের জননী অনেকদিন হইতেই রোগে ভুগিতে ছিলেন—সেবারকার শীত তাঁহার সহিল না। সংসারের অভাব ও পুত্রের হাত হইতে বৃদ্ধা মুক্তিলাভ করিলে রাধানাথ অকূলে ভাসিল। পঁচিশ বৎসর বয়সেও সে মায়ের অঙ্কের নড়ি—শিবরাত্রের সলিতা হইয়া, আপনার আহার নিদ্রা এবং নেশা ছাড়া সংসারের অপর কোন ভাবনা ভাবিবার অবকাশ পায় নাই। ছিপ-হাতে, গম্ভীর-মুখে রাধানাথ সারাদিন পুকুরপাড়ে বসিয়া বসিয়া আপনার ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া সে একটা উপায়ও স্থির করিল। ভাবিল, কলিকাতায় গিয়া চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। রাধানাথ শুনিয়াছিল, কলিকাতার পথে টাকা ছড়ান আছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়। রাধানাথ বাড়ী বিক্রী করিয়া দেনা শোধ করিল। তারপর অর্থোপার্জ্জনের আশায় কলিকাতায় গেল। মহানগরী কলিকাতার পথে যে অর্থ ছড়ান আছে, তাহা রাধানাথ অল্প দিনেই বুঝিয়া লইল, কিন্তু কুড়াইবার উপায় বা সন্ধান জ্ঞাত না থাকায়, তাহার আর কুড়াইয়া লওয়া সহজ বোধ হইল না।

২

এই ঘটনার পর অসংখ্য সুখদুঃখের কাহিনী বক্ষে ধরিয়া দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মঞ্জরী ভায়ের কোন সংবাদই পায় নাই, ভাইও তাহার কোন সংবাদ লয় নাই। মঞ্জরী চিঠি লিখিয়া চিঠি ফেরৎ পাইয়াছে; শেষে দেশের লোকের মুখে শুনিল, ভাই বাটী বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় চাকরী করিতে গিয়াছে। ঠিকানা না জানায় সে চিঠি লিখিতে পারিল না। মা নাই—ভাই কোথায়, সন্ধান নাই। দরিদ্র স্বামীর স্নেহ-ভালবাসাই তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা! মঞ্জরী ভাবিল, ভাই একটু 'থিতবিত' হইলেই তাহার সংবাদ লইবে। দিন গণিয়া গণিয়া মঞ্জরীর দিন ফুরাইয়া গেল—স্বামীর কোলে হীরক-কণার মত চারি বৎসরের ছেলেটিকে দিয়া সে সংসারের কাছে বিদায় লইল। মাতৃ-পরিত্যক্ত ছেলেটিকে প্রবোধ দ্বিগুণ স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিল। ছেলেটিও যেমন শান্ত—তেমনি সুন্দর! মঞ্জরী সুন্দরী ছিল—ছেলেটি মঞ্জরীর চেয়েও সুন্দর, বড় ঘরেও তেমন ছেলে কদাচিৎ চোখে পড়ে। মাতৃহীন বালক পিতার গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা কোথা গেল? আমার মা?" পিতা উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমার মা স্বর্গে গ্যাছে রবি।" বালক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি তবে কার কাছে শোব? কার কাছে থাকব? বাবা—আমার মা?" বালক ফুঁপাইয়া কাঁদিতে

লাগিল। পত্নী-হীন পিতা ছেলেটিকে বুকের আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেঁদো না—বাবা আমার—আমার কাছে তুমি থাকবে। আমার কাছে শোবে মাণিক!" কিন্তু এ প্রবোধ-বাক্য যে মিথ্যা, তাহা শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া গেল। ঠিক এক মাস পরে কাল কলেরায় প্রবোধও পত্নীর অনুগমন করিল। চারি বৎসরের শিশু রবি পিতামাতা হারাইয়া বৃন্তচ্যুত যুঁই-ফুলটির মত মৃত্তিকায় লুটাইতে লাগিল। পাড়াপ্রতিবেশীরা দয়া করিয়া ছেলেটিকে নিজেদের ঘরে লইয়া গেল। তারপর অনেক চেষ্টায় প্রায় ছয় মাস পরে হঠাৎ তাহারা একদিন রাধানাথের সন্ধান পাইল। রাধানাথ কলিকাতায় সস্ত্রীক আছে। সে চাকরী করে।

সব শুনিয়া রাধানাথ ছেলেটিকে নিজের কাছে লইয়া গেল। তাহাদেরও ছেলেপিলে নাই। সন্তানসুখ-বঞ্চিতা বন্ধ্যা মগ্নময়ী প্রথম এই আগন্তুকের আবির্ভাবে আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার দেবতা ও শুচিতাসম্পন্ন গৃহে এ আবার ভগবান কি নূতন উপগ্রহ জুটাইলেন? কিন্তু ছেলেটির মুখ দেখিয়া সে কথা আর তাহার মনে হইল না। "এস বাপ আমার—এই যে তোমার ঘর" বলিয়া মগ্ন ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই তাহার ঘর। অনেক দিনের পর রবি শুনিল, ইহাই তাহার ঘর। আশান্বিত চোখ তুলিয়া তাই সে ঘর ও ঘরের মানুষদের পানে চাহিয়া দেখিল। আগ্রহ অবসাদে পরিণত হইয়া গেল। কোথায় ঘর! এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত গৃহ, আর

ততোধিক অজ্ঞাত এই গৃহের মানবেরা। বালক ইহাদের কিছুই জানে না—কে জানে, এখানে তাহার আবদার কেহ সহ্য করিবে কি না। কে জানে, এখানে তাহার দুঃখ কেহ বুঝিবে কি না। সে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে—আর চুপ করিয়া মামা মামীর আদেশ পালন করে।

রাধানাথের প্রকৃতিটা কিছু গম্ভীর। তবু সে ভাগিনেয়কে ভালই বাসিত। দিনের মধ্যে বিশ বার সস্নেহ নেত্রে সে রবির দিকে চাহিয়া বলিত, "চুপ করে বসে থাক খোকা, দুষ্টুমি করো না—লক্ষ্মী ছেলে!"

রাধানাথ একঢিলে দুই পাখী মারিতে চাহিত; সে মনে করিত, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই খোকার শিষ্টতা শিক্ষা এবং তাহারও নিরুপদ্রব অভিভাবকত্ব—দুইই চলিয়া যাইবে। খোকার প্রতি তাহার যত্নেরও ত্রুটি ছিল না; আমটি—লিচুটি—বাতাসাখানি কিছু না কিছু নিত্য বাজারের সঙ্গে খোকার জন্য আমদানী হইত। মগ্নেরও যত্নের অভাব দেখা যাইত না; সকাল সকাল দুইটি ঝোল-ভাত বা একটু আমসত্ব দিয়া দুইটি দুধভাত স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়া ধুয়াইয়া মুছাইয়া একখানি ফরসা কাপড় ও সেলাই-করা ছিটের কোট্‌টি পরাইয়া, সে তাহাকে বাহিরের রোয়াকে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতে পাঠাইয়া দিত। আবার ঠিক তিনটা বাজিলে সে রবিকে ডাকিয়া কিছু জলখাবার খাওয়াইত; সন্ধ্যায় ভাত খাওয়াইয়া নিজের বিছানায় লইয়া শয়ন করিত। ছেলেটির খাওয়া পরার

এতটুকু এদিক ওদিক হইত না---ঠিক যেন কলের মতই তাহার শরীরধারণোপযোগী কার্য্যগুলি চলিয়া যাইতেছিল।

রাধানাথের স্ত্রী কাজের লোক, বসিয়া থাকা তাহার একেবারে অনভ্যাস। সারাদিন কাজ লইয়াই তাহার দিন কাটিয়া যায়। বাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ সারিয়া সে কাপড় "খারে" কাচে, ছেঁড়া সেলাই করে এবং কার্য্যাভাবে বাবুদের বাড়ীর সুপারি কাটিয়া ও বড়ি দিয়া দেয়। এই কার্য্যদক্ষতার সুখ্যাতি ঝি-মহলেও তাহাকে খুব উচ্চাসন দিয়াছিল। বাজে গল্প না করায় অনেকে তাহাকে "অহঙ্কেরে" বলিত; কিন্তু নিজেদের কাজ করাইয়া লইবার এমন সুদক্ষ যন্ত্রটিকে বিগড়াইয়া দিবার সাহস না থাকায় তাহারা প্রকাশ্যে তাহার কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসাই করিত। বালক রবি সারাদিন ধরিয়া এই আলস্যহীনা নারীর কার্য্য দেখিত, আর মনে মনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইত; কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথাই বলিতে পারিত না। শিশুসুলভ চঞ্চলতায় পাছে সে বাগানের ফুল ছিঁড়িয়া ডাল ভাঙ্গিয়া বাবুর অপ্রীতিভাজন হয়, সেই ভয়ে মগ্ন বারবার করিয়া রবিকে স্মরণ করাইয়া দিত, সে যেন বাগানে না নামে—যেন দুষ্টামি না করে। সম্ভবতঃ শান্ত-প্রকৃতির বালক কোন উৎপাত উপদ্রবই করিত না, তথাপি দিনরাত অনবরত "চুপ করে থাক, দুষ্টামি কোর না" শুনিয়া শুনিয়া তাহারও মনে কেমন জড়ত্ব ও অবসাদ আসিয়াছিল, সে নিজেদের ঘরের দালানে বসিয়া গেটের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিত। এক

ববএকবার ইচ্ছা হইত, মামার মত সেও গেট্ খুলিয়া দেয়এক্কং করে। একদিন সাহস করিয়া মামার নিকট কথাটা উত্থাপন করিল। রাধানাথ হাসিয়া বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, চুপ করে বসে থাক, লক্ষ্মী ছেলে।"

রবির বড় বড় কালো চোখ দুটি অভিমানে জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, সে চোখ নামাইয়া হাতের ছবির বইখানির ছবির পৃষ্ঠাটির দিকে নতমুখে চাহিয়া রহিল। রাধানাথ কখনও কোন জিনিসেরই ভিতর পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিত না, আজও সে বালকের অন্তরের ভাষা বুঝিল না, তুষ্টমনে শিশ্ দিতে দিতে যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

৩

এই সন্তানহীন দম্পতীর নিক্তিধরা নিয়মবদ্ধ ভালবাসায় বালকের প্রাণ যে দিন দিন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। খেলা করিবার সঙ্গী নাই, মনের কথা বলিবার শ্রোতা নাই, প্রাণ খুলিয়া মায়ের জন্য কাঁদিবার এতটুকু নির্জ্জন স্থান পর্য্যন্ত নাই। তোমরা হয়ত বলিবে, পাঁচ ছয় বছরের ছেলের আবার মনের কথা কি? কি যে কথা, তা তাহার মত পাঁচ বছরের ছেলেই বলিতে পারে। তবে পাঁচ বছরের ছেলেরও যে মন আছে, আর তাহারাও যে ভাবিতে জানে, সে কথা আমরা রবিকে দেখিয়াই বেশ বুঝিয়াছি। তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও সময় সময় কোথা হইতে হু হু করিয়া দুই চোখ

ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়ে। বামহস্তের উল্টা পিঠ দিয়া সে চোখ দুইটাকে ক্রমাগত মুছিতে থাকে, কিন্তু বৃষ্টির জলের মত অবিশ্রান্ত জলের ঝরণা ঝরিতেই থাকে, থামিতে চাহে না। মামী একদিন বলিয়াছিলেন, "রবি, তুমি ভারি ছিঁচ্‌কাঁদুনে—ছিঃ, বেটাছেলে কি কাঁদে?" মামীর অবশ্য উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না, তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই উপায়ে রবির চোখের জল সহজে বন্ধ করা যাইবে। এ মুষ্টি-যোগে কিন্তু সুফল দেখা যায় নাই—চোখের জল বর্দ্ধিতই হইয়াছিল।

রবি যে কাহারও সঙ্গ চাহিতেছিল, তাহাও ঠিক নহে; তবু কেমন একটা নিঃসঙ্গতার বেদনায় তাহার প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সে যদি কোন সহৃদয় সঙ্গী পাইত, পুলকে পুলকিত হইয়া বলিতে পারিত, তাহার আর খুব বেশী কান্না পায় না। সে মনে করিত, একটা নির্জ্জন যায়গা যদি সে পায়, তাহা হইলে বেশ হয়। এক একবার সেইখানে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সব কান্নাটা কাঁদিয়া আসে, তাহা হইলে আর চোখে জল আসিবে না। রবির মা লেখাপড়া জানিত, রবির বর্ণপরিচয় হইয়া গিয়াছিল। বাবা তাহাকে দুইখানি ছবিওয়ালা পড়িবার বই কিনিয়া দিয়াছিলেন, একখানি "প্রথম ভাগ" আর একখানি "পরীর গল্প"। রবি বানান করিয়া যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া পরীর গল্পখানি অনেকবার পড়িয়া ফেলিয়াছে—যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া পড়ায় অর্থবোধ হয় নাই, তবু পরী, দৈত্য এ সব সে বেশ বুঝিতে পারিত। শুধু যে

বুঝিতেই পারিত, তাহাও নহে, বিশ্বাসও করিত। যাহারা শিশু-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, ঐ যে বালকটি সিঁড়ির উপর একা বসিয়া রহিয়াছে, ওটি বালকই নহে; খেলাধূলার চেষ্টা না করিয়া বালক কি কখনও অমন করিয়া বিজ্ঞের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? বালকের হাতমুখ, কাপড়জামা কখনও অমন সাফ থাকে? কিন্তু র'বর সহিত সামান্য কথাবার্ত্তা কহিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। বালিকার মত কোমলতাপূর্ণ ঘন পাতায় ঢাকা বড় বড় কালো তারা দেওয়া—আসন্নবর্ষণমুখর সজল চোখদুটি কত সুন্দর? কথা-গুলি কেমন মিষ্ট, কি নম্র ব্যবহার? আর তার হৃদয়টি কি কোমল—করুণ, অল্প আঘাতেই কত বেদনা পায়! অবশ্য এটা চেষ্টা না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। তোমার যদি হৃদয়নামক কোনরূপ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার বালাই থাকে—তাহা হইলে উহাকে ভাল না বাসিয়া, কোলে না তুলিয়া, কখনই তুমি সরিয়া যাইতে পারিবে না।

সন্ধ্যার সময় দেউড়ীতে বসিয়া প্রদীপের ক্ষীণালোকে রাধানাথ ভাগিনেয়ের পাঠ বলিয়া দিত, কিন্তু শিক্ষকের বিদ্যার দৌড় ছাত্রের অপেক্ষা খুব বেশী না থাকায়, রবির শিক্ষার বিশেষ কিছু উন্নতি দেখা গেল না। বালক যদি সাহস করিয়া কোন দিন কোন কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিত, রাধানাথ অপ্রতিভ অভিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া এমন একটা দুর্ব্বোধ্য ভাষা উচ্চারণ করিত, যাহার অর্থ

বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় মল্লিনাথের আবশ্যক হইলেও বালক মাতুলের বিদ্যার বিশালতায় চমৎকৃত হইয়া নির্বাক হইয়া থাকিত। প্রশ্নের অর্থ প্রশ্ন অপেক্ষা জটিল হইয়া গেলেও তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে মাতুলের বিদ্যা-সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ হইত না। মামার সম্বন্ধে কয়দিনে রবি, এইটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল যে, মামা তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু কি প্রমাণে যে রবি তাহা বুঝিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে রবি তাহার সঠিক উত্তর দিতে পারিত না। তথাপি যে অলক্ষ্য আকর্ষণ প্রতিনিয়ত চুম্বককে লৌহের নিকটে টানে, সেই অলক্ষ্য নিয়মেই রবি বালক হইলেও বুঝিত, মামা তাহাকে ভালবাসে। তাহার ইচ্ছা করিত, মামার হাত ধরিয়া সে ঐ প্রকাণ্ড গেটটা পার হইয়া বাহিরে চলিয়া যায়, ঐ বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তাটা ধরিয়া বরাবর যেখানে রাস্তার শেষ হইয়া গিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। রাস্তায় যে সব লোক চলে, কেমন হন্ হন্ করিয়া দ্রুতপদে তাহারা চলিতে থাকে।—আচ্ছা, এত লোক কোথায় যায়? রবি যদি রবি না হইয়া রাস্তার লোক হইত, তাহা হইলে বেশ হইত। বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে রবির অভিজ্ঞতা বড় বেশী নাই—মা তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন, বাহিরে যাইতে বা অপর ছেলেদের সহিত মিশিতে পর্য্যন্ত দিতেন না। মা থাকিতে রবির কোনও অভাব বোধ ছিল না, সারাদিন সে মায়ের সহিত ছোটখাট কাজ করিয়া মায়ের সাহায্য করিতে পারায় মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত।

মায়ের সহিত সে খেলা করিত, সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম্ম সারিয়া চুল বাঁধিয়া কাপড় কাচিয়া ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দুয়ারে জল দিয়া শাঁক বাজাইয়া মা কতক্ষণে রোয়াকে মাদুরের উপর তাহাকে লইয়া গল্প বলিতে বসিবেন, সেই সময়টুকুর জন্যই পুলকিতচিত্তে সে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। কত বিচিত্র স্বপ্নপূর্ণ পরীর গল্প, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সলিলগর্ভে প্রবাল অট্টালিকায় নিদ্রিত রাজপুরীতে যে রূপসী রাজকন্যা শিয়রে সোণার কাটি রূপার কাটি লইয়া সর্পমস্তকের মণিহস্তে রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় গভীর নিদ্রায় সময় যাপন করিত, বিমাতার হিংসাতাড়িত হতভাগা রাজকুমার দ্বাদশ-হস্তপরিমিত যে কাঁকুড় ফলের ত্রয়োদশ হস্ত বীচির অনুসন্ধানে সহৃদয় মনুষ্যভাষাবিৎ পক্ষিপুঙ্গবের ছিন্নপক্ষ আরোহণে "তেপান্তর মাঠে"র রাক্ষসরাক্ষসীর কোন অভিনব দেশে যাত্রা করিত, সেই সব আশ্চর্য্য মনোরম কাহিনী কখনও সভয় দুরুদুরু বক্ষে—কখনও পুলকিত দেহে শ্রবণ করিত। পিতার সহিত কখনও তাঁহার কার্য্যস্থানে যাইত, সেখানে কেবল খনি আর কয়লার পাহাড়; কত বিচিত্র অবোধগম্য যন্ত্রপাতি—মাটীর নীচে কত বড় সুড়ঙ্গ! তাহার মনে হইত, ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া বরাবর নামিয়া গেলে বোধ হয় পাতালপুরীতে পৌছান যায়। সেখানে বাসুকি নাগ হাজার ফণায় মাণিকের বাতি জ্বালাইয়া পৃথিবীটাকে মাথার উপর ধরিয়া রাখিয়াছে। কপিল মুনি হয় ত তাহারই অদূরে হরিণের চর্ম্মের উপর বসিয়া চোখ মুদিয়া তপস্যা করিতেছেন! আরও কত কি

আছে। রবি সব জানে না, বড় হইলে সে যখন মায়ের রামায়ণ-খানা পড়িয়া ফেলিবে, তখন এক মুহূর্ত্তেই এই সব অস্পষ্ট অজ্ঞাত কাহিনীর সবটুকু রহস্যই তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে! রবির ইচ্ছা করিত, আর একটু বড় হইলেই সে একদিন পিতার নিকট অনুমতি লইয়া খনির ভিতরকার অপূর্ব্ব ব্যাপারটা দেখিয়া আসিবে। যে সব কুলী খনির ভিতর কাজ করিত, প্রশ্ন করিয়া করিয়া রবি তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলিত। "বাসুকিনাগ" "বলিরাজা" "কপিলমুনির" সম্বন্ধে তাহারা কল্পনাতেও কখনও কোন কৌতূহল অনুভব করে নাই—এসব কথা তাহারা বুঝিতেও পারে না। তবু এই প্রিয়দর্শন সুকুমার শিশুচিত্তে বেদনা দিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না, তাই রবির সকল কথাই তাহারা মানিয়া লইয়া আগ্রহ দেখাইয়া সায় দিয়া যাইত।

এমনি করিয়া সুখপূর্ণ কল্পনারাজ্যে মা-বাপের স্নেহময় পক্ষপুটে শিশু-রবি যখন শান্তিনীড়ে বর্দ্ধিত হইতেছিল, সেই সময় সহসা একদিন কাল-বৈশাখীর ভীষণ ঝটিকায় আশ্রয়চ্যুত পক্ষিশাবকটির মতই সে জলে কাদায় লুটাইয়া পড়িল। ভীষণ বজ্রাঘাতে পায়ের তলার মাটী সরিয়া গেল। বালক হইলেও রবি বুঝিল, সে আজ অনাথ,—আশ্রয়হীন, একাকী! প্রতিবেশী বাঙ্গালীরা তাহাকে আশ্রয় দিল। সুন্দর মুখের যে আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বরদত্ত—সেই আকর্ষণী শক্তিতে রবি তাহাদের স্নেহও লাভ করিল; তবু তাহার বুকের বেদনা ঘুচিল না। মা—তাহার মা? ক্ষুদ্র হৃদয়খানা

উদ্বেলিত করিয়া বুকের ভিতর রুদ্ধ হাহাকার ঠেলিয়া উঠিতে চায়—"মা! আমার মা।" রবির ইচ্ছা করে, সে অন্য বালকদের মত সামান্য খুটিনাটির ছুতা করিয়া একবার চীৎকার করিয়া "মা" "মা" বলিয়া কাঁদে, কিন্তু পারে না; স্বভাবতঃ তাহার সহিষ্ণু শান্ত প্রকৃতিই তাহাকে বাধা দেয়। তাহার উপর তাহার অবস্থা তাহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে থাকে যে, সে এখানে দয়ার পাত্র—তাহার কান্না হয়ত কেহ সহ্য নাও করিতে পারে।

মামামামীর আশ্রয় পাইয়া রবির চিত্ত অনেকটা শান্ত হইল—কিন্তু সান্ত্বনা পাইল না। রাধানাথ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, ছোট ছেলের সহিত খেলা করিয়া বা বাজে কথা কহিয়া, সে আপনার সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্যকে "খেলো" করিতে সাহস করিত না। হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের মতই গুম্ফ গালপাট্টায় পরিশোভিত গাম্ভীর্য্যের হাসি হাসিয়া তাহার দিকে স্নেহপূর্ণ কটাক্ষে চাহিয়া বারবার সেই একই কথা বলে—"লক্ষ্মী ছেলে চুপ করে বসে থেক, আর তোমার মামীর সব কথা শুনো—বুঝলে?" সন্তানহীনা মগ্নও সন্তানপালনের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিত না। ঘরকন্নার কার্য্যের পারিপাট্য, রাঁধিয়া-বাড়িয়া স্বামীকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান এবং অবসরকালে হরিনামের মালা জপ করা ছাড়া অপর কোন বিষয়ে তাহার চিন্তা বা সময় সে সাধ্যমত বৃথা অপব্যয় হইতে দেয় নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, ছোট ছেলেপিলেদের খাওয়া শোয়ার যত্ন করিতে পারিলেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা হইল! সুসজ্জিত পুতুলের

মতই তাহারা আনন্দদায়ক গৃহ-শোভা। আত্মতৃপ্তির জন্য তাহাদের যে প্রয়োজন আছে—এই কয় দিনের অভিজ্ঞতায় এই নূতন তত্ত্ব-টুকুই সে লাভ করিয়াছে। এখন চিন্তা, এই সুন্দর ছেলেটিকে কেমন করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আরও একটু হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারা যায়? মগ্নর বাপ জমীদার-বাড়ীর সরকার ছিল। মগ্ন জানিত, সরকারের পদ খুব সম্মানিত; কারণ, সে তাহার পিতার উপার্জ্জন ও চাকরবাকরদের প্রতি আধিপত্য স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সুতরাং তাহার একান্ত ইচ্ছা, রাধানাথ নিজের মত না করিয়া, ভাগিনেয়কে স্কুলে দিয়া একটু ভাল লেখাপড়া শিখাইয়া, জমীদারের বাড়ীর বাজার-সরকারের উপযুক্ত করিয়া তুলে, ভগবান তাহাদের উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যভার চাপাইয়া দিয়াছেন, তাহা পালন করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

রৌদ্রতেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে; মালীরা বাগানের গাছে জল দেওয়া শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভিজা মাটী হইতে একটা সুমিষ্ট সোঁদা গন্ধ উত্থিত হইতেছিল। রোদের তেজ কমিয়া যাওয়ায় রাস্তায় লোক-চলাচলও বাড়িয়াছিল। আফিসফেরৎ বাবুদের চলনে একটা ক্লান্তির ভাব, কলেজপ্রত্যাগত যুবকদের উৎসাহব্যঞ্জক গতি গোলদীঘির উদ্দেশে প্রধাবিত। ফিরিওয়ালারা বিচিত্র সুর হাঁকিয়া পথে চলিয়াছে। বাগানের সম্মুখের অংশে প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানার চওড়া সিঁড়ির উপর পা ঝুলাইয়া রবি

চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কোলের উপর বইখানির একটি বিচিত্র উদ্যানে পরী-রাণীর নিকট একটি দণ্ডায়মান বালকের ছবি দেওয়া পৃষ্ঠাটি খোলা রহিয়াছে। তাহার মন ও চক্ষু তখন অদূরবর্ত্তী লোহার রেলিংঘেরা প্রকাণ্ড গেটের উপর এবং তাহার ফাঁকের ভিতর দিয়া গেটের বাহিরে যে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ প্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এমনি করিয়া বহুক্ষণ সে এখানে বসিয়া আছে।

প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে কোচম্যান গাড়ী লইয়া আসিলে যখন একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক রবির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া, হাতের খবরের কাগজখানা পড়িতে পড়িতে গাড়ী চড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন হইতেই রবি ঠিক এইখানে এমনি করিয়া বসিয়া আছে। ভদ্রলোকটিকে রবি চিনিত, তিনি "বাবু"। মামা অনেকবার রবিকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সে যেন কোন রকম দুষ্টামী না করে, উৎপাত না করে, গাছের ফুলপাতায় না হাত দেয়—তাহা হইলে "বাবু" ব্যাজার হবেন। রবি দেখিতে পাইত—বাবু প্রত্যহ এই সময় গাড়ী করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন। যাইবার সময় প্রতিদিনই তিনি রবির দিকে চাহিয়া দেখিতেন। বাবুর সম্বন্ধে মামার নিকট হইতে সে যে সকল ভীতিপূর্ণ উপদেশ পাইত, সে সকল সত্ত্বেও বাবুকে দেখিয়া তাহার মনে কোন ভয় হইত না। তাঁহার বিষণ্ণ মুখ, কোমল দৃষ্টিপাত, রবিকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত—অনেকটা সেই জন্যই সে

এই সময় ঠিক এইখানে আসিয়া বসিত। বাবু চলিয়া গেলে রাধানাথ গেট্ বন্ধ করিয়া রবিকে শান্ত হইয়া থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গুন্ গুন্ করিয়া "সখী সে নিঠুর কালরূপ আর হেরব না" গায়িতে গায়িতে বাহিরে চলিয়া যাইত। রবির স্মরণশক্তির উপর রাধানাথের সতর্ক সাবধানতা রবিকে অনেক সময় পীড়িত করিয়াই তুলিত। রবি মুখ ফিরাইয়া তাহাদের ঘরের দিকে চাহিয়া থাকিত। খোলা জানালা দিয়া রাধানাথ-পত্নীর আলস্যহীন কার্য্য চঞ্চলগতি রবির চোখে পড়িত। ঘরধোয়া, বাসনমাজা, কাপড়তোলা সমস্ত কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে, একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া সে তখন ঘরের জিনিষপত্র, দেওয়াল-পাটের ছবিগুলি কড়ি-সজ্জিত বাঁশের আলনাটি পর্য্যন্ত ঝাড়ামোছা করিতেছে। হাতে-বোনা রঙ্গিন সূতার সিকের উপর মাটীর ভাঁড় ঝুলান আছে, বাতাসে তাহার মৃদু দোলনটুকু চোখে পড়িতে থাকে। রবির ইচ্ছা করে, মামীর কাছে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সে জড়াইয়া ধরে, কিন্তু অভিমানক্ষুব্ধ চিত্ত সেখানে যাইতে সাহস পায় না। কোন একটা অতর্কিত ঘটনার জন্য সে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কি যে সে ঘটনা, কিসেরই বা প্রতীক্ষা নিজে সে তাহা কিছুই জানে না। ক্রমেই চারিদিকের নির্জ্জনতা তাহার নিঃসঙ্গচিত্ত গভীরভাবে অনুভব করিতে লাগিল। বইখানি একবার পড়িবার চেষ্টা করিল,—যদিও বইখানির অর্দ্ধেক কথাই সে পড়িতে পারিত না, তবু গল্পগুলি সবই তাহার মুখস্থ

হইয়া গিয়াছে। ছবির পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে গল্পগুলি সে মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল। এই বইখানিই তাহার সব চেয়ে আনন্দের জিনিষ, তাহার প্রিয়তম সঙ্গী। বইখানি যেদিন রবির বাবা রবিকে আনিয়া দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া চুমার পর চুমা দিয়াছিলেন, সে কথা রবির খুব মনে আছে। সে আর ক'মাসের কথাই বা? বইয়ের উপরের মলাটে রবির মা নিজে হাতে নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন "শ্রীরবিলোচন রায়"। রবি যুক্ত অক্ষর পড়িতে পারিত না, তবু এই মাতৃ-হস্ত লিখিত যুক্ত অক্ষরটি চেষ্টা করিয়া শিখিয়া লইয়াছিল। 'মা' এই শব্দটি কতদিন কত-সময় সে লুকাইয়া মনে মনে আবৃত্তি করিত। রবির মনে অনেক কথা উঠিতেছিল—চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গিয়াছিল, হাটুর উপর হইতে পাতা-খোলা বইখানি কঙ্করময় পথে পড়িয়া গেল। আজ আর বইখানাও তাহাকে আনন্দ দিতে পারিতেছিল না। বইখানি কুড়াইবার জন্য রবি সিঁড়ি নামিয়া বাগানের পথে দাঁড়াইল, চোখের জলে সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, বই কুড়াইয়া লওয়া হইল না, বাষ্প-জড়িত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া মুখে হাতচাপা দিয়া, সহসা সে একদিকে অনির্দ্দেশ্য ভাবে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে ছুটিয়া গিয়া একটা জায়গায় ঘাসের উপর পড়িয়া খুব খানিক কাঁদিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাড়াইল। এ রকম তীব্র আন্তরিক দুঃখ অধিক কাল স্থায়ী হয় না—চোখের জল বাষ্প হইয়া অনেকটা দাহ কমাইয়া দেয়। নাহলে মানুষ সহ্য করিতে পারিবে কেন?

তাহার কাপড়জামায় ধূলা লাগিয়াছিল, মাথার চুলেও তাহার ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দনের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, ধূলা ও শুষ্ক ঘাসের কুটা শোভা পাইতেছিল। শুভ্র গণ্ডে অশ্রুজলের মলিন চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া রবির মনের ভার যেন অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া দাড়াইয়া, আগে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল— নাঃ—কেহ দেখিতে পায় নাই। আশ্বস্ত হইয়া আনন্দের সহিত সে নিকটবর্ত্তী একটা পুষ্পখচিত গন্ধরাজ গাছের দিকে অগ্রসর হইল। সে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেও একটা বাগান। বড় বড় গাছের কচিপাতায় স্থানটিকে বড় বেশী অন্ধকার করিতে পারে নাই, কেবল কোমল শ্যামলতায় ভরাইয়া তুলিয়াছিল। একটা অপরিচিত ফুলের গাছে অনেক ফুল ফুটিয়া আছে—সুগন্ধে দিক পূর্ণ। রবি অত্যন্ত সাবধানে কাপড় গুটাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহার ভয় হইতেছিল—পাছে সে গাছটা ছুঁইয়া ফেলে। চারিধারের সুগভীর নিস্তব্ধতায় তাহার মনে হইতেছিল—বুঝি সে পরীদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার ভয় হইল, সে ফিরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না, সাম্‌নেই একটি সরু রাস্তা; সে সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতর কোথা হইতে একটা ঘড়ি বাজিতেছিল, বাজনাটা অনেকটা কোকিলের সুরের মত, সে অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। তাহার মনে হইল, পরীদের গান—অমনি বুঝি, আনন্দ-কৌতূহলের সহিত ভয়ও বাড়িতেছিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে পাখীর ডাক আর

ঘড়ির বাজনা বড় মিষ্ট শুনাইয়াছিল। সে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার গা ছম্ ছম্ করিতেছিল ; কারণ, এ বাগান রবি আর কোন দিনই দেখে নাই। বাগানের চারিদিকে দেওয়াল, একদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দেওয়াল গেটের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছিল। গেটের ভিতরদিকেও আবার বাগান। সে বাগানটা খুব বড় নয়। বাগানের সমস্ত গাছে ফুল ফুটিয়া আছে। কতকগুলি ফুলের নাম তাহার জানা—বেল, যুঁই, ঝাঁটি চন্দ্রমল্লিকা। আরও কত ফুল আছে, রবি তাহার নাম জানে না। সে দেখিল, গেটের ভিতরের দিকে চাবী বন্ধ ; বাহিরের দিকে রবি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানেও অনেক গাছপালা। রবির মনে হইল, এটা একটা দৈত্যপুরী। সে চোখ মুছিয়া গেটের ধারে দাঁড়াইয়া, সাদা সাদা ফুলে-ভরা বাগানটির দিকে দেখিতে লাগিল। শান-বাঁধান রাস্তার উপর সাদা কাপড়-পরা একজন স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া রবির মার কথা মনে পড়িল, দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া, সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রমণী অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যেন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের মত একটা বিষাদে আচ্ছন্ন। তাঁহার চলনের ভঙ্গীতেও যেন অন্তরের গুরুভার ব্যক্ত করিতেছিল, নত-দৃষ্টিতে তিনি রাস্তা অথবা ফুল, কি যে দেখিতেছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। মধ্যে মধ্যে বক্ষবদ্ধহস্তে নত-দৃষ্টিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন। রবি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল, কেন তিনি

এমন চোখ নীচু করিয়া দাঁড়াইতেছেন? তাঁহার কি কোন দুঃখ হইয়াছে? রবির যখন দুঃখ হয়, কান্না যখন চাপিয়া রাখা যায় না, তখন সেও এম্‌নি চোখ নীচু করিয়া মাটির পানে চাহিয়া থাকে, চোখের জল কেহ দেখিতে পায় না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, রমণীকে দেখিতে কতকটা যেন তাহার মায়ের মত। মনে হইতেই তাহার গলার কাছে কি-একটা যে ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল, বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, দুই হাতে মুখ ঢাকিল, তার পর দরজার পাশে ঘাসের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রবির উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের অস্পষ্ট শব্দ হয় ত রমণীর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছিল। তিনি মুখ তুলিয়াই গেটের ধারে রবিকে দেখিতে পাইলেন। সহসা পায়ের নীচে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া সভয়ে পিছাইয়া যায়, তেমনি করিয়া রমণী পিছাইয়া গেলেন। তাহার মনে হইল, এখনি ছুটিয়া সে স্থান ত্যাগ করিবেন; কিন্তু সে ভাব তখনই চলিয়া গেল; মনে বল, হৃদয়ে ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া মৃদু-পদক্ষেপে তিনি গেটের ধারে দাঁড়াইলেন। অত্যন্ত কোমল-কণ্ঠে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, তোমার কি হয়েচে ধন—কাঁদ্‌চ কেন?" সুমিষ্ট কোমল-কণ্ঠ—সহানুভূতির স্বর। রবি তাহার উচ্ছ্বসিত মনের ভাবকে চাপিতে না পারিয়া, অব্যক্ত বেদনায় উচ্ছ্বাসভরা ক্রন্দনের স্বরে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"মা, মা!"

রমণীর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। মৌন বিবর্ণ আনত মুখে তিনি কম্পিত দেহের ভর রাখিবার জন্য রেলিংটি ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পা দুইখানা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মানসিক যন্ত্রণার চাপে পাংশু ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া কিছুক্ষণ এমনি ভাবেই কাটিয়া গেলে, অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া রমণীর স্নেহপূর্ণ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "খোকা—একটুখানি থাকো—আমি এখুনি চাবি খুলে দিচ্চি চাবি নিয়ে আসি, এ দোর কতদিন খোলা হয়নি—ওঃ তিন বচ্ছর!"

রমণী চলিয়া গেলে রবি উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল. শুভ্র গণ্ডে অশ্রুজলের মলিন চিহ্ন তখনও দেখা যাইতেছিল। কাপড়জামায় ধূলা লাগিয়া গিয়াছে, একবার মনে হইল পলাইয়া যায়—কিন্তু সে ত পথ জানে না। এ কোন অজ্ঞাত-দেশে সে আসিয়া পড়িয়াছে। আর ঐ রমণী! তাহার মৃত জননীকেই সে জগতের মধ্যে একমাত্র সুন্দর বলিয়া জানিত। ইহাকে দেখিয়া রবির মনে হইল, ইনি বোধ হয়, পরী! মানুষ কি অমন সুন্দর হয়?

রমণী তাড়াতাড়ি চাবি খুলিয়া দিলেন। জংধরা পুরাতন গেটটা বহুদিন অব্যবহারে—একেবারে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে অনেক আপত্তিব্যঞ্জক সাড়া শব্দ দিয়া গেট্ খোলা গেল, রবি পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, সান্ত্বনাপূর্ণ মৃদুস্বরে রমণী বলিলেন, "পালিও না গোপাল, কোন ভয় নেই! তোমার কি

হয়েচে? পড়ে গেছ? লেগেছে বুঝি? কি হয়েচে, আমায় সব বল।”

রবির বুকখানা তখনও উদ্বেলিত সমুদ্রবক্ষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট স্বরে সে কেবল বলিল—“মা।” সে চোখ বুজিয়াই পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। একখানি কোমল হাত তাহার পিঠের উপর রাখিয়া রমণী বলিলেন, “খোকা!” তাহার পরই তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—বুকের রক্ত সহসা যেন উছলিয়া উঠিল,—মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল; মনে হইল, দারুণ মানসিক উত্তেজনাই তাঁহাকে এমন অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

রবি অবাক্ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। বালক হইলেও সে বুঝিয়াছিল, ইহাঁকে ভয় করিবার কারণ নাই। সেই জন্যই তিনি যখন তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার মুখের হাত সরাইয়া দিয়া, আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলেন, তখন সে কোন বাধা দিল না। বরং তাঁহার বক্ষালিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার কোলের ভিতর মুখ লুকাইল। নিজে সে তখন থাকিয়া থাকিয়া হাঁফাইতেছিল, তথাপি কি এক অননুভূত পূর্ব্ব সুখে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল। এই অপরিচিত স্নেহস্পর্শে রবি তাহার মৃতা জননীর সুখস্পর্শটুকু অনুভব করিয়া সমস্ত দেহে একটা পুলক-তাড়িত-কম্পন অনুভব করিল।

বিস্ময় ও আনন্দের বেগ শমিত হইয়া আসিলে, রবি বুঝিতে পারিল, রমণী কাঁদিতেছেন। বিব্রত রবি ব্যাকুল-নেত্রে বার বার তাঁহার মুখের পানে চাহিতেছিল। সে ভাবিয়া পাইতেছিল না যে, কি করিয়া কি বলিয়া, সে সান্ত্বনা দিবে। রবি কাঁদে, তাহার যে মা নাই. সে ছেলেমানুষ,—তাই সে কাঁদে। কিন্তু ইনি কাঁদিতেছেন কেন? ইহাঁরও কি মা নাই? ইহাঁরও বুঝি খুব দুঃখ! তাহার মতই দুঃখ কি?

রমণী রবিকে বুকের কাছে টানিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "খোকা—খোকা!" রবির শুভ্র সুগোল ক্ষুদ্র হাতখানি আপনার কোমল হাতের ভিতর চাপিয়া বলিলেন, "গোপাল, তুমি রোজ রোজ আস্‌বে ত? বল, আস্‌বে ত?" রমণীর কণ্ঠে এমনি একটা উদ্বেগ-কাতরতা ধ্বনিত হইল যে, রবির মত বালকও যেন তাহার গভীরতা বুঝিল। সে মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিল, আসিবে। নিত্যই আসিবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রমণীর সহিত রবির খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া রমণী বলিলেন, "খোকা, আমরা যে কাঁদছিলুম. এ কথা কাকেও জানতে দেওয়া ভাল নয়, —কেমন?" সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—"না, তা হলে লোকে যে ক্যাবলা বলে।"—স্নেহপূর্ণ-নেত্রে বালকের সুকুমার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রমণী বলিলেন, "তোমার নামটি কি গোপাল, বল ত?"

রবি হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গম্ভীর-মুখে

উত্তর দিল, "আমার নাম গোপাল নয় ত—আমার নাম শ্রীরবি-লোচন রায়। আমার বয়স পাঁচ বচ্ছর!" রবির বিশ্বাস ছিল, নাম বলিতে গেলে বয়সের সংবাদও জানান অবশ্য কর্ত্তব্য।

"পাঁচ বচ্ছর—ওঃ—" একটা ব্যথিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস রমণীর অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল। রবির কুঞ্চিত তৈলসিক্ত চুলগুলির ভিতর কোমল অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে রমণী কহিলেন—"এস রবি, আমরা বাগানে বসি; তুমি তোমার সব কথা আমায় বল দেখি—কেমন করে তুমি এখানে এলে?"

"কেমন করে এলুম?—আমার দুঃখ হচ্ছিল, আমি চলে এলুম।"

রবি তাঁহার হাতের সোনার চুড়ীগুলি নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "আমায় দেখে আপনার দুঃখ হয়নি?"

"আমার—না, তোমায় দেখে আমার খুব আহ্লাদ হয়েচে, আমার বোধ হয়, সকাল-বেলাই আবার তোমার এখানে আসতে ইচ্ছে করবে—খেলা করতে। করবে না?"

"এঁ—খেলা করব—এখানে খেলা করব—কার সঙ্গে খেলব, আপনার সঙ্গে! আপনি খেলবেন আমার সঙ্গে?" বেদনার উপরই বারবার আঘাত লাগে। রমণীর বিষণ্ণ মুখ আহত বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। উদ্বেলিত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া দূরপ্রসারিত দৃষ্টি রবির মুখের দিকে ফিরাইয়া অত্যন্ত করুণ ক্লিষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন,—"আমি খেলব—তোমার সঙ্গে?—আচ্ছা, আমি চেষ্টা

করব।—খোকা—খোকা—তুমি যদি জান্‌তে—না থাক্‌। আচ্ছা, বল দেখি। তুমি কোথা থেকে এসেচ ?”

এক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষুদ্র রবির সমস্ত ইতিহাসটুকুই তিনি জানিয়া লইলেন। আহা, পিতৃমাতৃহীন বালক! অভাবের বেদনা বেদনাতুর-বক্ষেই বাজে। রমণী কহিলেন, “আচ্ছা, রবি তোমার মামা আর মামীমার কাছে ঐ বাড়ীতে থাক্‌তে তোমার ভাল লাগে ?” সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। এখন সবই তাহার ভাল লাগিতেছিল। দুঃখের মেঘটা কাটিয়া গিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি আবার জ্যোৎস্না-লোকিত আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রবি কহিল, “তাঁরা রাগ কর্‌বেন খুব ?”

রমণী উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?”

“আমি যে না বলে চলে এসেচি, আমায় তাঁরা লক্ষ্মী হ’তে বলেন। আমি তা হ’তে পারি না।” রবি একটুখানি ম্লান হাসিল।

“না, না, খোকা, তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা, আমি কি তাঁদের বল্‌ব, তুমি আমার কাছে এসেছিলে ?”

“আপনি বল্‌বেন ? কি করে আপনি তাঁদের চিন্‌তে পার্‌-বেন ?” রবি বিস্ময়পূর্ণ-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিল। রমণী স্নেহপূর্ণ-নেত্রে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “আমি চিনতে পেরেচি।”

বাগানের ভিতর একটি লতাকুঞ্জ ছিল, তাহার পাশেই জলের কল দেওয়া ফোয়ারা, ফোয়ারা দিয়া উর্দ্ধোত্থিত জলধারা ঝঙ্কার

মত চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিস্ময়-মগ্ন রবিকে কোলে করিয়া তিনি সমস্ত দেখাইতেছিলেন, কলের জলে মুখ ধুয়াইয়া অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিলেন। হৃষ্টপুষ্ট বালককে কোলে করিয়া বেড়াইতে তাঁহার ক্ষীণ দেহে তিনি পরিশ্রম অনুভব করিতেছিলেন না।

রমণী বলিলেন, "তোমার যতদিন না স্কুলে যাবার সময় হয়, তুমি রোজ সকালে এইখানে এসো। সকালটা আমি এই দিকেই থাকি, পড়ি—সেলাই করি, না হয়, চুপ্ করে বসে থাকি। দেখ খোকা, পড়ে যাবে—তোমার জুতোর ফিতেটা খুলে গাছে যে আমি বেঁধে দেব ?"

রবি নিজে ফিতাটা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, না পারিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "দেবেন ? দিন্ তবে।"

জুতার ফিতা বাঁধা হইয়া গেলে, রবি তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিলে, রমণী তাহার শুভ্র কপোলে চুম্বন করিয়া ক্ষীণ হাসির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় প্রণাম কর্‌লে যে খোকা ?"

"বাঃ ! আপনি যে আমার জুতোয় হাত দিলেন ?" রমণীর চোখের মধ্যে চিরস্থায়ী যে একটি বিষাদের ভাব নিবিড়তা রচনা করিয়াছিল, শরতের অপরাহ্নে যেমন মেঘাবরণ অপসারিত করিয়া, গগনের প্রশান্ত নির্ম্মলতা দেখা দেয়, তেমনি করিয়া যেন সেই

বিষাদের যবনিকাখানা মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়া গেল। তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন করিয়া, আর একবার জলের কল ও তাহা খুলিবার কৌশল দেখাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

* * *

এমনি করিয়া রবির দিনগুলি আবার আনন্দের কিরণে উজ্জ্বল হইয়া কাটিতে লাগিল। প্রতিদিন সকাল হইতেই রবি ব্যাকুল আগ্রহের সহিত তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—সময়ের অনেক পূর্ব্বেই সে সেই দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে বাড়ীটা দৈত্য বা পরীর বাড়ী নয়; সেটাও এই রকম বাড়ী। বাগানের একপাশে একটু মাঠের মত খোলা জমি, অন্য অন্য পার্শ্বে ঝোপের ন্যায় গাছপালা; দিনের বেলাও যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। এইখানে তাহারা হাত-ধরাধরি করিয়া বেড়ায়। সে কত আবোল তাবোল কথা বলে, কত অদ্ভুত রকমের প্রশ্ন করে, রমণী আগ্রহের সহিত তাহার প্রত্যেক কথাটি শ্রবণ করেন, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রথম তিনি ভাল খেলিতে পারিতেন না। থাকিয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন। অকারণে চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিত, ফুল তুলিবার জন্য বা বল কুড়াইবার জন্য রবিকে দূরে পাঠাইয়া দিতেন। রবি ফিরিয়া আসিয়া দেখিত, চোখে ধূলা পড়ায় তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন—তাঁহার চোখ দুইটি খুব লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে এ ভাব কমিয়া আসিল। যে দিন আকাশে জলঝড় দেখা দিত, তিনি রবিকে লইয়া বাগানের ভিতরে যে একখানা বড় ঘর ছিল, সেইখানে গিয়া বই পড়িয়া তাহাকে ছোট ছোট গল্প শুনাইতেন। সেখানে সে প্রায়ই অনেক ভাল ভাল খাবার খাইতে পাইত। ইহাতে সে আপত্তিও করিত, "এখানে খাবার খেলে পেট ভরে যাবে, মামীমা আমার জন্যে খাবার ক'রে রাখ্বেন যে ?" কিন্তু সে ইহাকেও দুঃখিত করিতে পারিত না, তাহার স্নেহতৃষ্ণাতুর হৃদয় স্নেহ পাইয়া আর সব ভুলিয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি দিনে দিনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সুগভীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রমণীর কথা ঠিক বলিতে পারা যায় না—কিন্তু সুদীর্ঘ বর্ষা-ঋতুর অবসানে শরতের যেমন একটা উজ্জ্বল সরস মধুরতা দেখা যায়, তাঁহার দেহে মুখে তেমনই একটা পরিবর্ত্তিত ভাব যেন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

৪

পাঁচটা বাজিতে কয় মিনিট বিলম্ব আছে! প্রকাণ্ড বাড়ীখানার মাথায় যে মস্ত ঘড়িটা দেওয়ালের সহিত গাঁথা ছিল, সেই ঘড়িটার দিকে উৎসুক-নেত্রে চাহিয়া রবি ভাবিতেছিল, আর ১৫ মিনিট পরেই বাবু বাহির হইয়া যাইবেন। কারণ, রবি দেখিয়াছে, প্রত্যহ এই সময়ই তিনি বাহিরে যান। বাবুর সুন্দর মুখে যে একটা বিষণ্ণ

ম্লান ছায়া সর্ব্বদা পরিস্ফুট থাকিত, তাহাই রবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

বৈশাখের অকালবর্ষণে খানিক পূর্ব্বে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া, ধরণীর তপ্ত বক্ষের সারাদিনের তাপদাহ জুড়াইয়া দিয়া, জলেস্থলে গগনেপবনে একটা স্নিগ্ধ শান্তির ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। বৃষ্টিধৌত গাছগুলার গাঢ় সবুজ শোভা! বৃষ্টির পর রৌদ্র দেখা দিয়াছে। বালকের হাসিকান্নার মতই তাহা তরল--করুণ। রৌদ্রে তেজ ছিল না, দীপ্তি ছিল। রবি প্রতিদিনের মতই সিঁড়ার ধাপের উপর পা ঝুলাইয়া গাছের পাতার শব্দ শুনিতেছিল। হাঁটুর উপর অঙ্কন-বই-খানার পাতা খোলা, রবি তাহার ত্রিকোণ চতুষ্কোণ আঁকা ছাড়িয়া দিয়াছে। হাতের মুঠায় বদ্ধ কর্ত্তিত সূক্ষ্ম-মুখ পেন্‌সীলটা। আজ তাহার পরিচ্ছদেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল; একটি সুদৃশ্য কালো রেশমি কাপড়ের জামা ও শান্তিপুরে মিহি একখানি ধুতি তাহার সুন্দর দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। রোদের আলোয় কোটের বোতামগুলি ঝক্ ঝক করিতেছিল। সকালবেলা রবির মামী রবিকে যখন এই পোষাকটি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তখন অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বলিয়াছিলেন, "পোষাকটা তুমি তোমার নিজের কোন গুণের জন্যে পাচ্চ মনে কোর না যেন—যাও।" সে কথা রবির বেশ মনে আছে। রবি জানিত, মামী তাহাকে ভালবাসে—তাহার গুণের জন্য না পাইলেও পোষাক পাইবার অন্য কোন কারণ অনুসন্ধানেরও সে আবশ্যকতা

অনুভব করিল না। মামা কহিলেন, "ভালছেলে হয়ে থেকো—দুষ্টুমী করো না। বাইরে বসে থাকগে।"

ফটকের বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া রবি ভাবিতেছিল, এ বেলাও যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হোত—বেশ হোত। অদূরে তাহাদের বাসগৃহের খোলা দরজা জানালার মধ্য দিয়া মগর কার্য্যরত মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল না। কাপড় আছড়ানর শব্দও থামিয়া গিয়াছে। গাছের পাতা নড়ার এবং রাস্তার উপর চলন্ত গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছিল সহসা একটা পরিচিত শব্দ রবিকে চকিত করিয়া তুলিল। দরওয়ান্ গেট্ খুলিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রবির প্রতিদিনের মতই ইচ্ছা হইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া মামার সাহায্য করে, কিন্তু স্বাভাবিক সংযমবলেই সে অবিচলিতভাবে আপনার স্থানটিতেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সশব্দে গাড়ী আসিয়া গাড়ীবারাণ্ডায় দাঁড়াইলে সিঁড়ি দিয়া প্রতিদিনের মতই বাবু নামিয়া আসিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, সহিস ও দ্বারবান্ তাঁহাকে সেলাম করিল। রবিও তাহার শুভ্র হাতখানি ললাট স্পর্শ করিয়া, মামার অনুকরণে আজ বাবুকে সেলাম করিয়া ফেলিল। অনেক দিন হইতেই এই ইচ্ছাটি তাহার মনে জাগিতেছিল, কেবল লজ্জায় তাহা পারিত না। আজও তাহার ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত গোলাপী রঙ্গে রাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল; নয়নে অধরে সুমিষ্ট সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। গাড়ীখানা আজ আর অন্যদিনের মত সশব্দে বাহির হইয়া গেল না; রবি ও তাহার মামা বিস্মিতনেত্রে

চাহিয়া রহিল। বাবু তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতেই সহসা যেন একটুখানি বিচলিতভাবে রবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি গাড়ী চড়ে আমার সঙ্গে যাবে খোকা?" রবি এই অতর্কিত নিমন্ত্রণে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "এঁ্যা—" রাধানাথ ভর্ৎসনাসূচক কটাক্ষে ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া, তাহাকে সচেতন করিয়া দিয়া, তীব্রস্বরে কহিল—"রবি?" বাবু গাম্ভীর্য্যপূর্ণনেত্রে রাধানাথের পানে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া রবির দিকে চাহিলেন; বলিলেন—"এসো।" সে স্বরে আর সে চাহনিতে রবি যে আশ্বাস পাইয়াছিল, তাহাতে হাতের ছবির বইখানা সেই-খানেই ফেলিয়া সে নামিয়া আসিয়াছিল; বাবু তাহাকে হাত বাড়াইয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। "ঠিক্ হয়েচে; তুমি ওদিকে একলা বস্‌তে পারবে, ভয় করবে না তো?" বীরত্বপূর্ণ স্বরে রবি কহিল—"কিচ্ছু না!"

গাড়ীখানি যখন গেটের বাহির হইয়া যাইতেছিল, তখন স্তম্ভিত-প্রায় রাধানাথের পানে চাহিয়া বাবু বলিলেন—"সাতটার সময় ফিরে আস্‌ব, কোন ভাবনা নেই তোমার।"

গাড়ী চলিয়া গেল; হতভম্ব রাধানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সেই দিকেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার জীবনে এত বড় অঘটন-সংঘটন আর কখনও সে হইতে দেখে নাই। সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও সে ইহার অধিক বিস্ময় বোধ করিত কি না সন্দেহ।

ছায়াঢাকা সম্মুখের পরিচিত রাস্তা ছাড়াইয়া গাড়ী যখন বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল, রবির বড় বড় কালো চোক আনন্দ ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! বাড়ীর বাগিরে পরী ও দৈত্যদের রাজ্য ছাড়া—মানুষের রাজ্যে যে এমন সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সুসজ্জিত দোকান, অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া, আরও কত বিচিত্র অদ্ভুত অজ্ঞাত দৃশ্য থাকিতে পারে, রবি কোন দিন তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহাদের রাণাগঞ্জে ত এমন কিছুই ছিল না।

স্নেহপূর্ণ-কটাক্ষে রবির পানে চাহিয়া, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আর কখনও এদিকে আসনি বুঝি?"

"না,—কখনও না।"

"তোমার ভাল লাগ্‌চে?"

উৎসাহের সহিত মাথা নাড়িয়া রবি উত্তর দিল, "খুব ভাল লাগ্‌চে।" কিন্তু শীঘ্রই তাহার সে আনন্দ ভয়ে পরিণত হইল। মোড় ফিরিবার জন্য গাড়িখানা বাঁকিলে রবির মনে হইল, এখনি বুঝি সে পড়িয়া যাইবে। একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বাবুকে সে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সাহস হইল না। তিনি রবির ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

শান্ত হইয়া রবি কহিল—"ও কি হয়েছিল? অমনতর হোল কেন?"

"গাড়ীখানা মোড় ঘুরল কি না; তুমি আমার পাশে বস্‌বে?"

"হ্যাঁ, নৈলে আমি পড়ে যাব।"

একটু বিষণ্ণ হাসিতে বাবুর বিষণ্ণ মুখের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি রবিকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এ সব দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌চে খোকা ?—"

"হুঁ !—আপনার ?"

"আমার ? আমারও লাগবে।"

"লাগচে না কেন ?" রবি সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। বাবু বলিলেন, "দেখ, দেখ, কত উঁচু ! ওর নাম কি জান ! ওকে বলে, মনুমেণ্ট ; তুমি একদিন ওর উপর উঠ্‌বে ?"

"উঠ্‌ব ! পড়ে যাব না ? আপনি থাক্‌বেন ত ?"

একটা প্রকাণ্ড অফিস-বাড়ীর নিকট গাড়ী থামিলে, বাবু রবিকে গাড়ীতে বসিতে বলিয়া নামিয়া গেলেন। ক্ষিপ্র-হস্তে দুই চারিটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়া, কর্ম্মচারীদের যথাযোগ্য উপদেশ প্রদানান্তর ফিরিয়া আসিলেন।

অফিসের দ্বারবান্ তেওয়ারী এক গ্লাস গরম দুধ ও সন্দেশ আনিয়া রবিকে খাওয়াইয়া গেল।

বাবু গাড়ীতে উঠিলে, গাড়ী আবার বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া রবি তাহার নূতন বন্ধুটিকে কহিল—"আপনার মুখ কেবলই দুঃখু দুঃখু হ'য়ে থাকে। এখন কিন্তু আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্চে।" রবি দেখিল, তাঁহার ম্লান-গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া গেল! কিন্তু সে তাহাতে ভয় পাইল

না, আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাবু তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া, আদর করিয়া, কহিলেন—"সোণা ছেলে!" বাড়ীর কাছে আসিয়া বাবু কহিলেন—"কাল সকালে আবার তুমি আস্‌বে ত?"

"হ্যা আস্‌ব—না আমি আস্‌তে পার্‌ব না!" তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সকালে বাগানে "তাঁহার" কাছে যাইবার কথা আছে; কথা দিয়া কথা না রাখা যে ভারী দোষ তাহা সে জানিত।

"আস্‌তে পার্‌বে না? কেন আস্‌তে পার্‌বে না? তোমার খুব বেশি কাজ আছে বুঝি?" বাবুর স্বরে নিরাশা বা আনন্দ কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। রবি খুব বেশি কাজের মানে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহার স্বর তাহার পছন্দ হইল না। কহিল—"দেখুন—।" কথাটা বলিতে গিয়াই রবির মনে পড়িয়া গেল যে সে বলিয়াছে যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কথা কাহাকেও বলিবে না। সে আগ্রহপূর্ণ নম্রস্বরে কহিল, "দেখুন, আমি বিকেলে আস্‌তে পারি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আমরা বিকেলেই বেড়াতে যাব; কাল তিনটের সময় তুমি ঠিক্ হ'য়ে থেক। 'না' বল্‌বে না ত?"

"না; আমি তিন্‌টের সময় আস্‌ব। ঐ বড় ঘড়িটায় তিন্‌টে বাজলেই আমি দাঁড়িয়ে থাকব। দেখুন, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগ্‌চে; আমার বাবার মত ভাল লাগচে!"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি খোকা ?"

"আমার নাম—আমার নাম শ্রীরবিলোচন রায়। আমার বয়স পাঁচ বছর।"

রাধানাথ ধীরে ধীরে গেট্ বন্ধ করিয়া, বাবু যে পথে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাগিনেয়কে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিল না।

৫

রবির সহিত এমনি করিয়া বাবুর ঘনিষ্ঠতা যখন বর্দ্ধিত হইল, তখন একদিন একটুখানি ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রবি, তোমায় সকাল বেলা আস্তে ব'ল্লে আস্তে পার না কেন ?" রবি দুঃখিতভাবে কোটের বোতাম খুঁটিতে লাগিল, উত্তর দিল না। অনেকবার ইচ্ছা হইল, সে বলে যে, তাহার গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার কথা সে তাঁহাকেও বলে নাই ; কিন্তু তাঁর কথা রবি ত বলিতে পারে না। তাই একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া সে বাবুর অঙ্গুলিগুলি নাড়িতেছিল।

এমন অনেক কথা আছে, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ; কিন্তু সামান্য একটু হাসি-চাহনিতে ছবির মত তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একটু স্নেহপূর্ণস্বরে বাবু কহিলেন—"আচ্ছা রবি ! তোমার গোপন-কথা ব'লে কাজ নাই—আমি তা শুন্তে চাইব না।"

বাবু ভাবিয়াছিলেন যে, রাধানাথের স্ত্রী সম্ভবতঃ সকাল-বেলাটা তাহাকে কোন কাজে আটক করিয়া রাখে; বাধ্য বালক কাজ ছাড়িয়া আসিতেও পারে না; আপত্তি করিতেও হয় ত তাহার সাহস হয় না। গোপন-কথার অর্থবোধ-সম্বন্ধে রবির অভিজ্ঞতা অধিক দূর অগ্রসর না হইলেও, তাঁহার বলিবার ভঙ্গি ও সুমিষ্ট সুরটি রবির ভারী মিষ্ট লাগিল; সে অকারণে খুব হাসিতে লাগিল। তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া হেমেন্দ্রবাবুর বিষণ্ন মুখের গাম্ভীর্য্যের আবরণখানা যেন একটু একটু করিয়া সরিয়া পড়িতেছিল।

৬

দশটা বাজিয়া গেল। রমণী হাতের মাসিকপত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। শ্রাবণের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে রোদ ও বৃষ্টির চকিত লীলাভিনয় চলিতেছিল। এখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টিধৌত বৃক্ষপত্রের শ্যাম চিক্কণতা, গাছে গাছে পাখীর দল কিচ্-কিচ্ শব্দ করিয়া ভিজা ডানা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শান্ত হইয়া বসিয়া আছে। বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া গাছের পাতা দোলাইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল; সর্ব্বত্রই বায়ুতাড়িত জড়পদার্থের মধুরালাপ। রমণী উৎকণ্ঠিত আগ্রহপূর্ণনেত্রে বারবার বাগানের দিকে চাহিতে-ছিলেন। টেবিলের উপর একখানি রূপার থালায় কতকগুলি আঙ্গুর গুচ্ছ, আপেল, আতা, নেংড়া আম বস্ত্রাচ্ছাদিত; তাহার ঢাকনাটা, খুলিয়া রাখিলেন। একধারে কতকগুলি খেলনা,

ব্যাট্‌বল ছবির বই সজ্জিত ছিল। একখানি রুলটানা খাতায় আঁকাবাঁকা হাতের লেখা, তাহার ক্ষুদ্র অধিকারীর স্মৃতিচিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। দওয়ালের গায়ে একখানি ঘড়ি টাঙ্গান আছে, লাটাইটা অদূরে একটা ত্রিপদীর উপর যত্নে রক্ষিত।

রমণী সতৃষ্ণচক্ষু বারবার বাগান হইতে গেটের বাহিরে যাতায়াত করিতেছিল। ক্রমে প্রতীক্ষা অসহ্য হওয়ায়, তিনি বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়া, সঙ্কুচিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাগানের সরু রাস্তাটি ধরিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন, মনের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া পড়িতেছিল। ব্যাকুলচিত্ত ক্রমাগতই অশুভ কল্পনায় অধীর হইতেছিল— ঘড়িটা কি ভুল চলিতেছে? গেট্‌টা বন্ধ নাই ত? না, খোলাই আছে? সে কি তবে ফিরিয়া গিয়াছে? কিন্তু তিনি ত কোথাও সরিয়া যান নাই, বারবার এইখানেই ত উপস্থিত রহিয়াছেন! না ডাকিয়াও সে ত কখনও ফিরিয়া যায় না। তবে? নিরূপিত-সময়ে অনুপস্থিত আজ যে রবির প্রথম। এমন ত আর কোন দিন ঘটে না! কথারাখা তাহার স্বভাব, জলঝড়েও সে বাধা মানিত না। কতদিন এইজন্য শাসনস্থলে প্রচুর স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। সময় সময় হয় ত সংসারের কাজে তাঁহারই আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, রবি তাহার বড় বড় কালো চোখের ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া সাভিমানে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "এত দেরি হ'লো কেন মা?" মরিচাধরা ঐ লোহার রেলিংঘেরা, গেট্‌টা

যে আর কখনও খোলা হইবে, একথা ছ'মাস পূর্ব্বে তিনিও মনে করিতে পারেন নাই। এই অন্ধকার শব্দহীন গৃহখানাতে আবার যে কোন দিন বালকণ্ঠের কলহাস্যধ্বনি মুখরিত হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অপ্রত্যাশিত। অন্ধকার নিশীথে বিদ্যুৎ বিকাশ হয় অন্ধকারের গাঢ়ত্ব প্রতিপাদন করিতে; ইহাও কি তবে তাই? একি মরীচিকা যে, সুগভীর বেদনা হৃদয়ের সমুদয় অংশটিকে জুড়িয়া রাখিয়াছে, তাহার মূল উৎপাটন করিতে হইলে, হৃদয়খানাকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়;—তাহা ত জীবনান্তের সঙ্গী। যে অসীম দুঃখের গাঢ় অন্ধকার অন্তঃকরণের সবটুকু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুগভীর অন্ধকারে সুমধুর আলোক-রেখাটির মত আনন্দের যে ক্ষীণ ধারাটি মৃদুভাবে ঝরিতেছিল—সে যে ঐ রবি। চোখের উপর হইতে সরু পথটি, ঝোপঝাপওয়ালা বাগানখানি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। মেঘ কাটিয়া গিয়া অম্লান রৌদ্রে সমস্ত আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। শান বাঁধান ছোট পুকুরের জলে ঢেউগুলি হীরককণার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল—রাঙামাছের দল প্রতিদিনের মতই জলের ভিতর সন্তরণ-বিদ্যার অনুশীলনে হর্ষোৎফুল্ল। বাতাসে গাছের পাতার মর্ম্মরধ্বনি। আপাদমস্তক পুষ্পখচিত লেবু গাছটির ঝোপের ভিতর লুকাইয়া গন্ধবিভোর বর্ষার কোকিল সুগভীর স্তব্ধতাকে থাকিয়া থাকিয়া সচকিত করিয়া দিয়া ডাকিতেছিল, "কুউ-উ।" জড় ও চৈতন্যের মর্ম্মে মর্ম্মে একটা বিস্মৃত স্মৃতির পুলক-রেখা সর্ব্বত্রই সজাগ।

"সে কেন এল না—কেন এল না সে?" একটা অস্ফুট আশঙ্কা ক্রমাগতই তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। জীবনের পাত্র হইতে যে দুইএরই স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নিকট তিক্তস্বাদ দুঃখ বা মিষ্টস্বাদ সুখ, দুইই যে সুপরিচিত। তথাপি বন্ধনজাল অনিচ্ছাতেও এমনি নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, যে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "সে কি তবে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? কোন নূতন ক্ষুদ্র সঙ্গী কি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে? কাল সকালে বিদায়ের পূর্ব্বেও যে সে তাঁহাকে সুকোমল ছোট হাত দুইখানির স্নেহবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন দিয়াছে; চুম্বনের সে চিহ্নটুকুও বুঝি খুঁজিলে মেলে, সুখস্পর্শটুকু এখনও যে অন্তরে অনুভূত হইতেছিল। তবে? হা ঈশ্বর! বুঝি তাঁহার অদৃষ্টের সহিত স্নেহবন্ধনে জড়িত হইতে চাহিয়াছিল বলিয়াই বালকের কোন বিপদ ঘটিয়াছে? ভাবিতে বুকের যখন বেদনা অসহ্য হইয়া পড়িল, রমণী তখন আসন ছাড়িয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। এখনই তাহার খবর চাই। নিশ্চয়ই তাহার কিছু অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

ঠিক সেই সময় গেটের অপর দিক্‌কার ঘরখানির দরজা খুলিয়া গেল। রমণী তড়িতাহতের মত ফিরিয়া দেখিলেন, না, এ রবি নহে—আগন্তুক তাঁহার স্বামী। দুই বৎসর পরে আজ প্রথম তিনি ঘরে আসিয়াছেন;—এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর তিনি সাবধানে বাড়ীর এই অংশটিকেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে

তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া যখন ঐ পুষ্পখচিত উদ্যান মধ্যে ঐ শুভ্র বেদির উপর আসিয়া বসিতেন, তখন আর একখানি ছোট মুখ তাঁহাদের দুইজনের মাঝখানে কি গভীর আশা-আনন্দের আলোকেই প্রদীপ্ত হইয়া ফুটিত। টগর ও বাতাবীলেবুর ফুলে ভরা বাগানের ঐ অংশটিতে যে সুকোমল হাস্য লহরী তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি স্নায়ুজালের উপর আনন্দের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করিয়া ধ্বনিত মুখরিত হইত, তাহার অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি এখনও বুঝি বাতাসে লাগিয়া রহিয়াছে। কাণ পাতিলে শুনা যাইবে। তারপর, একদিন বিশ্ব যখন জ্যোৎস্নাজলে স্নান করিয়া, সেফালিকার সুগন্ধি মাখিয়া, পাপিয়ার কলঝঙ্কারে দিগন্ত মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তেমনি জ্যোৎস্না-রাতে মায়ের বুক হইতে কুন্দকলির মত শুভ্র নবনীর ন্যায় কোমল সেফালিগুচ্ছের মত সুরভি ফুলটিকে ছিনাইয়া লইয়া নিষ্ঠুর কাল কোন অনির্দ্দেশ্য পথে যাত্রা করিয়াছে। সেই দিন হইতেই ঐ লোহার গেট্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সে আর ফিরিয়া আসিবে না! তাই চিরদিনের জন্যই তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল!

হেমেন্দ্রনাথ সেই দিন হইতেই অট্টালিকার এ অংশ ত্যাগ করিয়াছেন; ভুলিয়াও আর এদিকে পদার্পণ করেন না। পরিত্যক্ত সর্পনির্ম্মোকের মত অতীতটাকে যদি পরিত্যাগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বুঝি ভালই হইত। তাই, সেই চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত প্রাণপণে করিয়াও আসিতেছিলেন। রমণী যে শোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চায়, পুরুষ তাহা হইতে দূরে

থাকিতেই ভালবাসে। রমণীর সহিষ্ণুতা অধিক, তাই সে আঘাত পাইলেও আহত অংশটাকে বাদ দিতে রাজি হয় না।

রমণী বুঝিলেন, স্বামী অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই অচিন্তিত দৃশ্যটিকে গ্রহণ করিতেছিলেন। এখানে এমন করিয়া আবার যে এই সব ছোট ছোট স্মৃতিচিহ্ন সজ্জিত হইতে পারে, ইহা বাস্তবিকই তাঁহার ধারণার অতীত! তিনি কি পত্নীর নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতায ক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছেন? তিনি কি সত্যসত্যই বিশ্বাস করিয়াছেন যে, "মণি"কে সে ভুলিয়া গিয়াছে? তাহারই শূন্য সিংহাসনে অন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার স্মৃতিকেও মুছিয়া ফেলিয়াছে! অতীত ও বর্ত্তমানের সংক্ষুব্ধ স্মৃতির তাড়নায় তাঁহার অন্তরে যে নিদারুণ ঝটিকা উত্থিত হইতেছিল, বাহিরে তাহার অধিক প্রকাশ বুঝা গেল না। কম্পিত দেহের ভর দ্বারের উপর রাখিয়া, অত্যন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া, রমণী স্বামীর প্রতি চাহিলেন; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কখন দেখা যায় অতি দুঃখেও মানুষ হাসে। হেমেন্দ্রনাথ হাসিয়া স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অনেক দিনের পর স্মৃতি-সাগরের তলদেশ আন্দোলিত করিয়া, যে গভীর বেদনা ও আকস্মিক উত্তেজনা তাঁহার অন্তরে উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল, মুখে তাহারই সুগভীর ছায়া ফুটিয়া উঠিল। অভিজ্ঞেরা সে হাসি দেখিলে নিঃসন্দেহ ভীত হইতেন।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রমণী বুঝিলেন, স্বামী যে জন্যই হাসিয়া থাকুন, তাঁহাকে তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যের ভাব সে মুখে

নাই। প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া স্বামী কহিলেন— “অরুণা!” কথাটা শেষ না করিয়াই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নত দৃষ্টিতে চুরুটটার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে কি না তাহাবই পরীক্ষা করিতে করিতে কহিলেন—“তুমি আশ্চর্য্য হচ্চ—আমি—আবার—এখানে—এসেচি। তুমি হয় ত জান না, বাড়ীর বাইরে একটি ছোট ছেলে আছে, ভগবান্ তাকে আমার কাছে পঠিয়ে দিয়েছিলেন—রাধানাথ তার মামা—অতি নির্ব্বোধ হতভাগা সে, সে আমায় খুসী করবার জন্যে ছেলেটিকে গাছে উঠ্‌তে বলে; ফল পাড়্‌তে ছেলেটি প'ড়ে গিয়ে—। অরুণা অরুণা ভয় পেয়েচ?”

“না, না, তারপর—তার কি হোল- ওগো বল, কি হোল তার?”

হেমেন্দ্রনাথ অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, পত্নীর মুখখানি একেবারে পাঙাস হইয়া গিয়াছে; সমস্ত দেহ বায়ুতাড়িত বেতসপত্রের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। পত্নীর কম্পিত হাতখানি সস্নেহে আপনার হস্তে ধারণ করিয়া, সুগভীর করুণা-পূর্ণ দৃষ্টিতে হেমেন্দ্রনাথ পত্নীর উদ্বেগ-পীড়িত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—“শান্ত হও, অরুণা, আমি ভয়ের কথা কিছু বলিনি ত। আমি তোমায় জানাতে এসেছিলুম—”

“বল, কি জানাতে এসেছিলে বল—আমি সব সইতে পারব—”

রমণী হাঁফাইতেছিলেন। চোখে জল ছিল না; একটা উত্তপ্ত অগ্নিশিখা যেন চোখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল।

পত্নীর আকস্মিক বিচলিতভাবে বিস্মিত হইয়া হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ছেলেটির ডান-হাতের হাড় ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তার সরকার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন। আমি বলছিলুম, রাধানাথের ত ঐ ঘরদোর—ওখানে ত ভাল জায়গা নেই, ওখান থেকে ওকে সরালে হো'ত না?"

"না, না, ওগো তা কোরনা, তাকে হাঁস্‌পাতালে পাঠিও না তুমি।" অরুণা ব্যগ্রভাবে স্বামীর বাহু অবলম্বন করিল।

"না—তা পাঠাব না। আমি ভাবছিলুম, ওকে বাড়ীতে এনে রাখলে হয় না! না থাক্, তাতে কাজ নেই—তোমার অসুবিধা হবে, হয় ত? ছেলেটি বড্ড ভাল—আহা বাপ মা নেই। রাধানাথ তার নাম—" হেমেন্দ্রনাথ পত্নীকে আর একটু কাছে টানিয়া কোমলতর স্বরে পুনরায় কহিলেন—"এখন তুমি যা ক'র্‌বে, বল্‌বে, তাই হবে!"

স্তব্ধ গৃহে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সুগভীর নিস্তব্ধতা বিস্তৃত হইয়া রহিল। অনেক্ষণের পর অরুণা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল। সে চক্ষু তাঁহারই মুখের উপর স্নেহবর্ষণ করিতেছিল! কে বলে সে হতভাগিনী?—এমন করুণাময় উদার উন্নত-হৃদয় স্বামীর স্ত্রী সে। জীবনের—জন্মের এতখানি সার্থকতা সত্যই সে পাইয়াছে। আর সেই স্নেহের বন্ধন? তাঁহাদের দুইটী জীবনতন্ত্রীর একই সুর। কে বলে সে নাই? তাঁহাদের অন্তরের সবখানটাই যে সে জুড়িয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সে নাই, কিন্তু তাহার স্মৃতি ত

আছে ? আর সে স্মৃতিও আজ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ নহে—বিশ্বের সকল শিশুর ভিতর তাহার স্মৃতি এক হইয়া ক্ষুদ্র 'স্ব'কে বৃহৎ করিয়া তাহার কত স্মৃতিকে বৃহত্তর করিয়া তুলিয়াছে।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অরুণা দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ; "এদিকে এস—তুমি যার কথা বল্‌চ, এসব তারই জন্য। রোজ সকাল-বেলা সে আমার কাছে আস্‌ত, খেলা কর্‌ত, পড়্‌ত, তাকে যেদিন পথম দেখি, সে ঐ গেটের ধারে ঘাসের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে তার মা'র জন্যে কাঁদ্‌ছিল। আমি মনে করেছিলুম, তার কথা সব তোমায় বল্‌ব ; কিন্তু বল্‌তে পারিনি। আমার মনে হ'য়েছিল, তুমি হয় ত আমায় ভুল বুঝ্‌বে, ভাব্‌বে খোকাকে—আমার বাদুকে—আমি ভুলে গেছি। রবি আমায় শান্তি দিয়েচে—তাকে অবলম্বন ক'রে আমি সকল ছেলেকে ভালবাস্‌তে শিখে, আমার হারাধনকে ফিরে পেয়েচি।"

হেমেন্দ্রনাথ সুগভীর স্নেহের সহিত পত্নীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আবেগের অশ্রু হু হু করিয়া তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। অশ্রুতে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি সব বুঝ্‌তে পেরেচি অরুণা ! আমাকেও সে সুখী করেচে—তার ভালবাসা দিয়ে সে আমায় জগৎকে ভালবাস্‌তে শিখিয়েচে। আজ মণি আমার একলার নয়, জগতের সকল ছেলেই আমার মণি।"

একটা সুগভীর নিঃশ্বাসে হৃদয়ভার লঘু করিয়া দিয়া অরুণা কহিল—"ভগবান্ তাকে আমাদের কাছে এনে দিয়েচেন। সে

তাঁরই দান। তাকে ভালবেসে আমরা মণির কাছে অপরাধী হব না—।" তাহার বেদনাতুর বক্ষে যে করুণ স্বর ধ্বনিত হইতেছিল, যেন তাহারি অনুরণন সারাবিশ্ব প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সংশয়াকুল চিত্ত নিজের কাছে অনেকবারই এই প্রশ্ন তুলিয়াছে—সন্দেহ অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছিল। আজও তাই ঐ কথাই তাঁহার মনে হইল। মৃত সন্তানের স্মৃতির নিকট সত্যই কি তিনি অপরাধিনী হইতে চলিয়াছেন! পরের ছেলেকে ভালবাসিয়া নিজের স্বর্গগত পুত্রকে অবহেলা করিলেন না ত? রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া হেমেন্দ্রনাথ কহিলেন—"ডাক্তার তার কাছে ব'সে আছেন—তুমি যাবে কি সেখানে—তার কাছে?"

বাগানের ধারের সুসজ্জিত প্রশস্ত গৃহে জানালার ধারে খাটের উপর রবি শয়ন করিয়াছিল। পাশে বসিয়া সস্নেহনেত্রে চাহিয়া অরুণা তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছিল। রবির হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে কিছুক্ষণ অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন—"ডাক্তার ব'লে গেলেন, কাল তুমি উঠে বেড়াতে পাবে: আসচে হপ্তায় আমরা দার্জ্জিলিংএ যাব।"

"দার্জ্জিলিংএ যাবেন—সে কোথায়?"

"সে অনেক দূর—পাহাড়ের উপর দেশ—খুব সুন্দর জায়গা সে।"

"পাহাড়ের উপর সেখানে বাড়ী আছে? লোকেরা থাকে কোথায়?"

"তুমি গেলেই দেখ্‌তে পাবে, খুব বেড়াবার সুবিধা সেখানে। বাড়ী আছে বই কি—কত ভাল জিনিষ দেখ্‌বে।"

রবি খুসী হইয়া হাসি-মুখে কহিল—"বাবু কোথায় গেলেন ?—এখনি আস্‌বেন ব'লে গেলেন যে !"

"ঐ যে তিনি আস্‌চেন—বাবুকে তুমি ভালবাস রবি ?" খোলা জানালা দিয়া রবি চাহিয়া দেখিল, হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব ভালবাসি—দেখুন"—রবি তাহার সুন্দর মুখের মিষ্ট হাসিতে সুধা ঢালিয়া দিয়া কহিল—"দেখুন—বাবুকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে আজ ? আমার ইচ্ছে করে, ওঁকে আমি বাবা ব'লে ডাকি।"

রমণী উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়াই প্রফুল্লমুখে কহিলেন—"সব ঠিক্ হ'য়ে গেল—রাধানাথের স্ত্রী কিন্তু ভারী কাঁদ্‌চে। তার একটুও ইচ্ছে ছিল না।"

স্বামীর পানে চাহিয়া ব্যথিতস্বরে অরুণা উত্তর দিলেন, "আহা, হবে না—তারা ত আপনার জন ! আমার কিন্তু ওর উপর ভারী ভুল বিশ্বাস ছিল। আমি ভাব্‌তুম, পাথরে-গড়া পুতুল ও, মন্ টন্ বুঝি কিছু নেই। ওদের জন্যে, একটু ব্যবস্থা ক'রে দিলে ত ?"

হেমেন্দ্রনাথ সস্নেহ-দৃষ্টিতে রবির পানে চাহিয়া কহিলেন—"হাঁ মহল চাকরাদিতে ওকে তদশিলদারের কাজে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম। লেখাপড়া কিছুই জানে না তেমন ত, ক'র্‌বেই বা

কি ? ইচ্ছে হ'লে রবিকে মাঝে মাঝে দেখে যেতে ব'লে দিলেম,—যাবার সময় রবিকে দেখে যেতে বলায়, সে কি ব'ল্লে জান ? সে ব'ল্লে "বাবু আমায় মাপ ক'র্‌বেন—সে সুখে আছে, তার সুখের জন্যে আমি তাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু মানুষের মন বড় পাজী, তার মুখ দেখ্‌লে হয় ত তাকে ছেড়ে দিতে পার্‌ব না। লোভ থেকে দূরে থাকাই ভাল।" রবির ছোট হাতখানি নিজ করতলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"আচ্ছা রবি, আমাদের কাছে বরাবর তুমি থাক্‌তে পার্‌বে ত ? ভাল লাগ্‌বে তোমার ?"

অরুণা তাহার দুই ব্যগ্র চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টি বালকের মুখে স্থাপিত করিয়া, প্রতিধ্বনি করিল, "থাক্‌তে পার্‌বে ত ? বল—বল—বরাবর থাক্‌বে—ছেড়ে যাবে না কোথাও ?"

সে আগ্রহব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে রবি তাহার বড় বড় কালোচোখের বিস্মিত দৃষ্টি দুইজনের মুখে স্থাপিত করিয়া, অত্যন্ত সহজ সুরে কহিল—"এখানেই আমি থাক্‌ব ত মা। তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবনা ত !"

কেহ শিখাইয়া না দিলেও রবি যে অরুণাকে কেন আজ মাতৃ-সম্বোধন করিল, তাহা শিশু-হৃদয়ে যিনি সুখ-অনুভূতি দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। হয় ত অরুণার মুখে আজ এমন কোন মাতৃভাব প্রকটিত হইয়াছিল, যাহাতে রবির মা-হারা চিত্ত আজ মাতৃ-সম্বোধনের লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না। অরুণা মুখ ফিরাইয়া খোলা জানালার বাহিরে জলভারাকুল দৃষ্টি ফিরাইয়া

অন্তরের সুখদুঃখের উদ্বেল আঘাতটা সহিয়া লইতেছে, বুঝিয়া হেমেন্দ্রনাথ পত্নীর আরো কাছে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"আর সে কাজটাও আজ শেষ ক'রে ফেলা গেল। ইঞ্জিনীয়ার সুরেনবাবু অনাথ-আশ্রম তৈরীর সব ভার নিয়েছেন।" একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিলেন—"মণির নামে যে কুড়ী হাজার টাকা ছিল, সেটাও ঐ কাজে খরচ হবে। আশ্রমের নাম 'মণি-আশ্রম' রাখাই ঠিক্ হোল।"

অরুণা উঠিয়া মাটিতে জানু পাতিয়া ভূমে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিতে, হেমেন্দ্রনাথ তাহার পাশে বসিয়া তেমনি করিয়াই সেই দুঃখের মধ্যে সুখপ্রদাতা অনন্ত মঙ্গলময়ের উদ্দেশে প্রণত হইলেন। স্বর্গীয় সন্তানের পূর্ণ কল্যাণ কামনায় হৃদয়োত্থিত প্রার্থনা অব্যক্ত ভাষায় শেষ করিয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইলেন রবি তাহার ছোট হাত দুখানি যুক্ত করিয়া উর্দ্ধনেত্রে প্রণাম করিতেছে। তাহার শুভ্র গণ্ডে দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া পড়িয়াছে। অরুণা কাছে আসিয়া, সেই সজল কোমল গণ্ডে চুম্বন করিয়া ধরা-গলায় কহিলেন—"তোমার প্রাথনাই সেখানে পৌঁছুবে মাণিক্—তুমি বল সে যেন তৃপ্তি পায়,—যেন সুখে থাকে।"

রেবা

১

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অশনি বি-এ পরীক্ষা দিয়া কাশীধামে মাতৃ-দর্শনে আসিল।

অশনিকান্ত ঘোষালের আদিবাস হালি-সহরে; কলিকাতায় জ্যেঠা-মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া সে রিপণ কলেজে পড়িত। তাহার পিতা জগদীশচন্দ্র ঘোষাল বহুকাল কাশী-রাজার 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারী'র কাজ করিয়া তিন বৎসর হইল কাশী-প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা ভার্য্যা তাঁহারই অনুসৃত পন্থার আকাঙ্ক্ষায় কাশীতেই রহিয়া গেলেন। ছুটীর পর অশনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া যায়, কখনও মা তাহার সঙ্গে যান, দুই-একমাস ভাসুরের বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় কাশীতে চলিয়া আসেন। অশনি ছুটীর সময় কাশী আসে এবং ছুটীর শেষ-দিনটি পর্য্যন্ত পরম নিরুদ্‌বেগে কাটাইয়া, পুনরায় কলিকাতায় ফেরে।

কাশীতে শুধু যে অশনির মা-ই ছিলেন, এমন নয়;—আরও একটি প্রবল আকর্ষণ অশনিকে তীর্থবাসী করিয়া তুলিয়াছিল। সে আকর্ষণটা 'রেভারেণ্ড' বঙ্কুবিহারী গুহের কন্যা রেবা।

রেবা মাতৃ-পিতৃ-হীনা। অভিভাবিকা এক খুড়ীর তত্ত্বাবধানে

সে কাশীতে বাস করিত এবং 'শিগ্‌রা মিশন স্কুলে' বিদ্যাশিক্ষা করিত। রেবাদের বাড়ী অশনিদের বাড়ীর কাছেই। সর্ব্বদা দেখা-শোনা এবং যাতায়াতে বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল। মাতৃহীনা রেবা অশনির মাকে মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার মনের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া লইয়াছিল। অশনি তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, শিক্ষক, খেলার সাথি। বয়সের সহিত শৈশবের অনাবিল স্নেহ যে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছিল, তাহা সমবয়সী এই দুই বিভিন্নশ্রেণীর নরনারীর নিজেদের মনের অগোচর না হইলেও বাহিরের লোকে কাণাঘুসা করিতেছিল। অশনির মা-ও ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

অশনি আশৈশব রেবার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেও নিষ্ঠাচারপরায়ণা মাতা ও পিতার শিক্ষা, সাহচর্য্য ও দৃষ্টান্তে মনের মধ্যে যথেষ্ট জাত্যাভিমান পোষণ করিত। কিন্তু কিছুদিন হইতে তাহার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। সে এখন জোর করিয়া রেবার স্বহস্তে প্রস্তুত লুচি-মোহনভোগে উদর তৃপ্ত করে, রেবার জলের কুঁজা হইতে জল লইয়া খায়, এবং আরো ছোট-বড় অনেকগুলি আপত্তিজনক কার্য্যে মাতার মনে যথেষ্ট বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এবার বাড়ী আসিয়াই অশনি শুনিল তাহার বিবাহ। বৈশাখের প্রথমেই যে-দিনটা শুভলগ্ন লইয়া উপস্থিত হইবে, সেই দিনেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অশনি প্রথমে রাগ

করিয়া মুখভার করিল, ভাল করিয়া খাইল না; মাতার সহিত কথা কহিল না। কিন্তু যখন এ মুষ্টিযোগে মায়ের উৎসাহের হ্রাস হইতে দেখা গেল না, তখন সে মায়ের কাছে গিয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল,—"এ-সব কি শুন্‌চি ?—এ রকম ত কোন কথা ছিল না।"

মা তখন স্নানের পর উঠানে রোদে বসিয়া পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি মেলিয়া দিয়া, চটের উপর ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া কলাইয়ের দালের বড়ি দিতেছিলেন। ছেলের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন,—"কি রকম কথা ছিল তবে, শুনি ?"

অশনি মুখ ভার করিয়া কহিল,—"আমি ত তোমায় বরাবর ব'লে আস্‌চি, পড়া শেষ না হ'লে, বিয়ে টিয়ে কোর্‌বো না।"

পুঁটির মা এতক্ষণ কাঁশী-ভরা পিষ্ট দালে সঘন কর-তাড়নায় রীতিমত ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে দাদাবাবুর বিবাহে সোণার তাগা ও তসরের সাটী ফরমাইস দিয়া হস্ত-বেদনার উপশম করিতেছিল। দাদাবাবুর গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বরে তাহার আশার প্রদীপ অনুজ্জ্বল হইয়া পাড়ল। ছেলের কথায় মা ততোধিক গম্ভীর-মুখে কহিলেন—"কিন্তু আমি ত তোমায় বরাবরই ব'লে আস্‌চি যে, ও-সব বিদ্‌কুটে আব্‌দার চলবে না। বি-এ পরীক্ষা দিয়েই তোমায় বিয়ে ক'র্‌তে হবে।"

অশনি শ্লেষের স্বরে কহিল,—"তার চেয়ে সোজা কথায় বল না, অতীন্দ্র চৌধুরীর টাঁকশালকে ঘরে আন্‌বে; বৌ আন্‌বে না!"

মা হাতের কাজ বন্ধ না করিয়া, মুখ না তুলিয়া কহিলেন—"সে তোর যা খুসী মনে করিস্। বিয়ে তোকে ক'র্‌তেই হবে। সে কি কথা? ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি! আর মেয়ে? খাসা মেয়ে! ইচ্ছে হয়, নিজের চোখে দেখে আসিস্। তোর যাতে মন্দ হবে,তেমন কাজ আমি কোর্‌বো না,এবিশ্বাস তুই আমার' পরেও রাখ্‌তে পারিস্।"

এ কথার পর আর তর্ক করা চলে না। অশনিও তাহা করিল না। সে চলিয়া যাইবার সময় কেবল নিজের অসম্মতিসূচক অস্ফুট বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে গেল। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন—"এ ঝড় যে উঠবে, তা আমি আগে থেকেই জানি। ভালয় ভালয় এখন দু'হাত এক করতে পাল্লে বাবা বিশ্বনাথ, তোমায় সোনার বেলপাতা দিয়ে ষোড়শো পচারে পূজো দেব ; ছেলের আমার সুবুদ্ধি দাও।"

তাহার পর অশনি বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে জাজিম-মোড়া তক্তাপোষের উপর পড়িয়া, খানিক গড়াইয়া, খানিক খবরের কাগজের অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন স্তম্ভে চোখ বুলাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, রেবা হয় ত, এতক্ষণ তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। চিঠিতে সে রেবাকে আশা দিয়া রাখিয়াছে, এবার তাহার কবিতার খাতা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে সে-গুলি দুই জনে মিলিয়া বাছাই করিয়া লইবে। উৎসর্গ করিবে কাহাকে, তাহাও স্থির হইয়া আছে। কেবল বইখানির নাম লইয়াই মতভেদ চলিতেছিল।

এবার কাশী আসিয়া অশনি রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই, রেবাই আসিয়াছিল। অশনির মনে হইল, এই কয় মাসের অদর্শনে রেবা যেন অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! তাহার সে অকারণ হাসি আব্দার নাই! তাহার চালচলন এত গম্ভীর যে, অশনির মনে হইতেছিল, সে যেন হাত বাড়াইয়া আর তাহার নাগাল পাইতেছে না। হয় ত, মায়ের এই সব পাগলামীর খেয়ালও সে শুনিয়াছে,- এই কথাটা মনে হইতেই অশনি মনে মনে অত্যন্ত লজ্জানুভব করিল।

২

রেবা তাহার পড়িবার ছোট ঘরখানিতে একখানি ইংরাজী নভেল হাতে লইয়া পড়িবার ভাণে বসিয়াছিল। পাঠের ইচ্ছা তাহার এতটুকুও ছিল না। সে বসিয়াছিল কেবল ভাবিবার জন্য। কিছুদিন হইতেই সে অশনির বিবাহের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে; উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহাও দেখিতেছে। যতক্ষণ সেখানে থাকে, সেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু এখন বাড়ী আসিয়া তাহার আর এতটুকুও আনন্দোৎ-সাহ অবশিষ্ট ছিল না। সে কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল! দেশালাইয়ের কাঠিটা যেমন প্রথম-ঘর্ষণেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়, রেবার সচেষ্টিত আনন্দের আলোটুকুও তেমনি ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া একেবারেই

নিভিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অশনির এইবার বিবাহ হইবে। একটি নোলক-পরা কিশোরী বধূ তাহার বিচিত্র ছাঁদের কবরী ঢাকিয়া, ঘোম্‌টা টানিয়া, আল্‌তা-পরা দু-খানি কোমল চরণে জলতরঙ্গ মলের রুণ্‌ঝুণ্‌ বাজাইয়া অশনির অন্তরেও তাহার অনুরণন্‌ তুলিবে। সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত কিশোরী মেয়েটির ঝাপ্টাকাটা মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অশনির কবিতার উৎস এইবার ভিন্ন-পথাশ্রয়ে বহিবে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য সেইখানেই সে দেখিতে পাইবে ;—ক্ষুদ্র বাল্য-বন্ধুত্বের কথা বা নগণ্য বাল্যসখীকে তাহার আর মনেও পড়িবে না। রেবা কল্পনানেত্রে দেখিল, অশনির মুখে যেন আনন্দের দীপ্তি ! পত্নী-প্রেমে সে পরিতৃপ্ত !

একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাংশু আকাশে রেবা তাহার উদাস-নেত্র ফিরাইল। জ্বালাময় তেজ ম্লান করিয়া অপরাহ্নের সূর্য্য ডুবিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তেজ কমিলেও ধরণীর তপ্ত-বক্ষের সমস্ত সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এইবার উর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া বাতাসটাকে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পিছন হইতে মৃদুহাসির শব্দ শুনা গেল। রেবা চমকিয়া মুখ ফিরাইল ; সঙ্গে সঙ্গে মধুর হাসিতে তাহারও মুখখান উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"কখন এলে, অশনি ?"

অশনি কহিল- "অনেকক্ষণ—যতক্ষণ থেকে তুমি খুব মন দিয়ে পড়া কচ্ছিলে। এবার পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে দেখ্‌তে।

রেবা সলজ্জ মৃদু-হাস্তে কহিল—"ঠাট্টা হচ্চে! কেন? অমনোযোগটা কিসে দেখ্‌লে শুনি?"

অশনি রেবার হাতের পাতা-খোলা বইখানি কাড়িয়া লইয়া প্রসারিতভাবে তাহার চোখের সাম্‌নে ধরিল; হাসিয়া কহিল—"কিছু না। কেবল বইখানা কি রকম ক'রে ধ'র্লে পড়া এগোয়, তাই শিখে নিচ্ছিলুম্?"

রেবা চাহিয়া দেখিল, সত্যই ত! পুস্তকখানা সে সম্পূর্ণ উল্টাভাবে ধরিয়াছিল। কি সর্ব্বনাশ! এমন আত্মবিস্মৃত সে! হারিয়া হার স্বীকার করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। রেবাও তাহার জাতীয়ধর্ম্ম বিস্মৃত হইল না। অকারণ কোলাহলে এক রকম করিয়া প্রতিপক্ষকে স্বীকার করাইয়া লইল যে, পাঠে তাহার মনোযোগের অন্ত নাই এবং বইখানা উল্টাভাবে ধরিলেও পাঠকের পাঠে ব্যাঘাত হয় না।

অশনি আসন গ্রহণ করিলে রেবা কহিল—"তারপর মহাশয়ের স্বদেশ গমন হ'চ্চে কবে?"

অশনির মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল; সে ক্লিষ্টস্বরে কহিল—"মার ইচ্ছে এবার শীঘ্রই দেশে যাওয়া হয়—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল—শুধু মার ইচ্ছে। মশায়ের তাতে অনিচ্ছে না কি?"

অশনি। আমার! তুমি ত জান রেবা, ছুটির একটা দিনও আমি বাইরে নষ্ট করি না? কেন তাও জানো। আর এবারকার এই লম্বা ছুটিটা—।

"তোমার অনেক দয়া অশনি, কিন্তু সংসারে ঢুকে হয় ত এ গরীব বন্ধুটির কথা আর মনেও থাকবে না।" রেবা এই কথাটা হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও হাসি দিয়া শেষ করিতে পারিল না। অকারণে চোখে জল আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত করিতেছিল। অশনি বিস্মিত-চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইল। তারপর স-রহস্যে কহিল—"বাঃ! বিনয়-প্রকাশও যে ঢের শেখা হ'য়ে গেছে দেখ্‌চি! মহাশয়া, বুঝি, সম্প্রতি কোন নূতন সংসারে ঢোকবার মৎলবে আছেন; তাই ভূমিকায় জানান্ দেওয়া হ'চ্ছে?"

রেবা মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"আর লুকোচুরীতে কাজ কি? আমি ত কিছু জানি না?"

অশনি মনোযোগ দিবার ভাণ করিয়া কহিল—"কি জান শুনি?"

রেবা। যা জান্‌বার। আগামী ১৭ই বৈশাখ অতীন্দ্রবাবুর কন্যা শ্রীমতী কনকলতার সহিত শ্রীযুক্ত অশনিকান্ত ঘোষালের শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে—

অশনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"থামুন মহাশয়া! আর জ্যেঠামির দরকার নেই।"

রেবা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে কহিল—"জ্যেঠামি কিসের? সত্যি কথা বল্‌ব, তাতে বন্ধু বিগড়ান্ বিগ্‌ড়বেন; যদিও জানি, বন্ধু ঐ সত্যি কথাটা শোন্‌বার জন্যে সহস্রকর্ণ হ'তেও প্রস্তুত আছেন; মুখে যতই কেন তর্জ্জন করুন্ না!"

অশনি শান্তভাবে কহিল—"বন্ধুর আর যা অপবাদ দিতে ইচ্ছে হয় দাও ; ঐটে দিও না। বিয়ে আমি কোর্‌বো না।"

রেবা। কেন? মা ত বল্লেন, করবে?

অশনি। মা জানেন না। অনর্থক ভদ্রলোককে আশা দিয়ে ভোগাবেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলেচি, এখানে বিয়ে আমি কোন মতেই কোর্‌বো না—।

রেবা মুখ তুলিয়া কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা অকারণে কাশি আসায় কথাটা আর বলা হইল না। অসহ্য গ্রীষ্মে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এখনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় মৌন ভঙ্গ করিয়া অশনিই প্রথমে কহিল—"জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে—কেন করব না—শুনবে কি?"

অশনির কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টিতে এমন কোন ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, যাহাতে তাহার অব্যক্ত উত্তর শুনিতে রেবার সাহস হইল না। ঘরের বাতাসটাও যেন ভাবাবেগে স্পন্দিত হইতেছিল ; না জানি, এখনি সে কি অপ্রকাশ্য গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিবে! হয় ত, চিরপ্রার্থিত চিরদুর্ল্লভ উত্তর এখনি সুলভ হইয়া প্রকাশ পাইবে। ওগো সে কথা, সে গোপনীয় কথা গোপনীয়ই থাক্। সে ত প্রকাশের যোগ্য নয়। তবে আর কেন? রেবা মাথা নাড়িয়া অশনির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, না, সে শুনিতে চাহে না।

"কেন না?" অশনি দমিল না। উৎসাহে সোজা হইয়া কহিল—"'না' বোল না? তোমায় শুনতেই হবে। তুমি কি আমার মনের কথা জান না? নিজেকে এত বোকা সাজিও না, রেবা! তুমি সবই বোঝ। আমার ভালবাসা আমায় ভুল বোঝায় নি। বল, আমার মনের কথা তুমি জান?"

রেবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিপন্নভাবে কহিল—"এ সব কথা তুমি কাকে বলচ? অশনি বুঝ্‌তে পাচ্চ কি?"

ঠিক্ পাচ্চি। যাকে ছাড়া জীবনে আর কাকেও এমন ক'রে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না; যে নইলে সংসার আমার শ্মশান হ'য়ে যাবে, যে আমার শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের প্রিয় সখী—সেই রেবাকেই আমি আমার মনের কথা খুলে বলচি।"

রেবা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আরক্তমুখে স্খলিতবাক্যে বাধা দিল, "থাম অশনি! এমন ক'রে তুমি আমায় অপমান কোর না।—আমি জান্‌তুম না, তুমি নেশা কর্‌তে শিখেচ! জান্‌লে—।" জানিলে সে যে কি করিত, সে-সম্বন্ধে কোনও উপস্থিত যুক্তি খুঁজিয়া না পাওয়ায় সে চুপ করিল।

অশনি কিন্তু বাধা মানিল না। সে রেবার গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে কহিল—"মিছে কথা ব'লে আমায় হাসিও না রেবা। তুমি জান, তোমায় অপমান কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। আমার কথার জবাব দাও। বল, আমার স্ত্রী হ'তে তুমি অসম্মত নও।"

রেবা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল ; নতমুখে কহিল—"ও-সব পাগ্‌লামীর কথা ছেড়ে দাও। তুমি হিন্দু, আমি খৃষ্টান। কেবল এই প্রভেদটা ভুলে যেও না।"

অশনিও এ-কথা ভুলিয়া যায় নাই। ভুলে নাই বলিয়াই এতদিন দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া চুপ করিয়াছিল ! তাহা না হইলে মনের কথা প্রকাশের সুযোগ আরও অনেক আগেই সে লইত। ভাবিতে গেলে, ভাবনার কূলকিনারা পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রেবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাকে লাঞ্ছনা এবং ততোধিক ক্ষতিও যে সহিতে হইবে, এ কথা সে ভালই জানে। বিষয়ে বঞ্চিত হইতে না হউক, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ, এমন কি, জগতে একমাত্র স্নেহের স্থান মাতৃকোলের অধিকারেও সে বঞ্চিত হইবে। তা হউক্ ; রেবাকে ছাড়িয়া সংসারে তাহার সুখ নাই ; তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া যাইবে। প্রেমের খাতিরে সংসারের সকল সুবিধাই সে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত। রেবাকে ত্যাগ করিলে সে বাঁচিবে না। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে। মাতার কাছেও সে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। তাহার ফলে মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতেছেন। বাকী ছিল রেবার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলা। এই বলার জন্য মন তাহার আকুলী বিকুলি করিতেছিল ; তবু সঙ্কোচের হাত সে যেন কোন মতেই এড়াইতে পারিতেছিল না। এ ভালই হইল, রেবা নিজেই সুগম পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য যখন স্থির করাই আছে,

তখন আর অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন কি ? মাতাও আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না ; বাহিরেও কন্যাভারাতুর কোন ভদ্র- লোককে আশান্বিতও করিতেছেন। এ খেলার উপসংহার হইয়া গেলেই যে এখন বাঁচা যায় ! রেবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী। তাহাতে কি আসিয়া যায় ? ভালবাসার কাছে কি তুচ্ছ, হাস্যকর সে বাধা ! পর্ব্বতগৃহ-নিঃসৃতা সিন্ধু উদ্দেশ্যে প্রধাবিতা নদীর বেগ কি সামান্য প্রস্তরের বাধায় রুদ্ধ হইতে পারে! প্রচণ্ড ঐরাবতও যে এ স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়। অশনি মুখ তুলিয়া দীপ্তচক্ষে চাহিল, কহিল—"রেবা ! আমাদের ভালবাসার কাছে ওর কি এত বেশী দাম ! এ সব তুচ্ছ বাধায় আমাদের মিলনকে বাধা দিতে পারবেনা। আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম নিয়েও তোমায় পেতে চাই।"

রেবার দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত-স্বরে সে কহিল,—"ধর্ম্মত্যাগ কোরবে ? বল কি অশনি !"

অশনি মৃদু হাসিয়া কহিল—"না ত্যাগ কোরবো না ? শুধু ঠাকুরের নামটা বদলে নেব। তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না ; কিন্তু না নিলে, আমার ক্ষতির শেষ থাকবে না রেবা।"

রেবার সমস্ত দেহ মন সেই ঝড়ের দোলায় এক মুহূর্ত্তের জন্য দুলিয়া উঠিল। তবু সে আত্মহারা হইল না, এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল—কিন্তু এ ধর্ম্মমত ত তুমি তাঁর জন্যে বদল কোরচ না। নিজের সুবিধের জন্যে, শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব খুটিনাটি, দোষগুণ সহ্য কোরতে পারবে কি না—?"

রেবা তাহার কথার শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তাহারও যে দৃষ্টি ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল ! হয় ত, এ দুর্ব্বলতা এখনি অশনির চোখে পড়িবে, এই ভাবিয়া সে সংযত হইল।

অশনি উঠিয়া ঘরখানা বার-দুই পরিভ্রমণ করিয়া রেবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "এত ভেবে কাজ কর্‌বার আমার সাধ্য নেই। রেবা ! আমার মনের কথা তোমায় সব জানিয়েচি। স্পষ্ট উত্তর দাও, তুমি আমার স্ত্রী হ'তে রাজি আছ কি না ?"

রেবা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"কি যে বল ! সবাইত আর তোমার মত পাগল নয় !"

তবুও অশনি জোর করিয়া তাহাকে ভাবিতে সময় দিল ও সেই সঙ্গে বলিয়া দিল, "এটাও ভেবো,—আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, ধর্ম্ম-সব ছেড়েও আমি অনায়াসে থাক্‌তে পার্‌বো, কিন্তু তোমায় ছাড়্‌তে হ'লে আমি বাচব না।"

রেবাকে কথা কহিবার সময় না দিয়া, এবং নিজের কথা শেষ না করিয়া, ছাতিটা পর্য্যন্ত না লইয়াই সে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জানালা দিয়া রেবা চাহিয়া দেখিল, রাস্তাতেও সে আর ফিরিয়া চাহিল না।

•

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অশনি রেবার সঙ্গে দেখা করিল না। রেবা তাহার বুড়ী-মার মুখে শুনিল, ছেলের সহিত ঝগড়া করিয়া অশনিকে

মা দেশে চলিয়া গিয়াছেন ; অশনি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। এমন ঘটনা রেবার অভিজ্ঞতায় আর কখনও ঘটে নাই। মা যখনই দেশে গিয়াছেন, অশনি তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। রেবা নিজে গিয়া তাঁহাদের ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এবার অশনির মা দেশে গেলেন, কিন্তু রেবাকে একটা মুখের কথা বলিয়াও গেলেন না! রেবা দুই দিন তাঁর কাছে না গেলে, তিনি ডাকিতে আসিতেন, কত স্নেহের অনুযোগ করিতেন। আজ রেবা তাঁহার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছে যে, মুখের কথা একটা বলিয়াও গেলেন না! সে কেবলই চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল! তবে কি অশনি সেই সব তার পাগলামির কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে?—তাহাই সম্ভব। ছিঃ ছিঃ! তিনি কি মনে করিলেন! লজ্জাহীনা রেবার স্পর্দ্ধায় কতই না তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। অশনি পাগল, তাই সে এমন ছেলেমানুষি কথা আবার লোকের কাছে প্রকাশ করে। রেবাই কি তাহাকে ভালবাসে না? বাসে বই কি! সে ছাড়া রেবার ভাল বাসিবার আর কে আছে? রেবার মনে হইল, হয় ত সে অশনিকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে না; যে ভালবাসায় জাতি-ধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় যুক্তি-তর্ক মানিয়া চলা যায় না। অশনির সেই বিশ্বগ্রাসী উদ্দাম ভালবাসার সহিত সে তাহার বিচার-বিবেচনাপূর্ণ সাধ্যঘাট বাঁধা ভালবাসার আবার তৌল করিতে চায় না কি? ছিঃ!

সে কি তাঁহার যোগ্য! রেবা কল্পনা-নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের একখানা রঙ্গিন চিত্র আঁকিয়া দেখিতে চাহিল।—চিত্রখানা বড় মলিন দেখাইল। অশনির মনের এ তীব্র অনুরাগ কে জানে কতদিন স্থায়ী হইবে! উদ্দীপনার অবসানে শুধু রেবার প্রেমেই কি তাহার পরিত্যক্ত অতীত জীবনের সকল স্মৃতির অভাব পূরাইতে পারিবে? যে সমাজ রেবার সহিত তাহার আবাল্যের বন্ধুত্বেও তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, শুধু একটা বন্ধনের স্বীকার উক্তিতেই সে কি নিজ হইতে মনেপ্রাণে তাহার আপন হইয়া যাইবে? তুচ্ছ রেবার জন্য এতখানি ক্ষতি সহিতে মন তাঁহার দুই দিনেই হয় ত অস্থির হইয়া উঠিবে। পুরাতনের জন্য মন যখন তাঁহারা হাহাকার করিবে, রেবা তাঁহাকে তখন কোন্ সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিবে।

রেবা ভাবিয়া দেখিল, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করা ছাড়া, তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে ভালবাসা প্রিয়ের ক্ষতি করে, সে ভালবাসা ত ভালবাসা নয়! সে উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা কখনও স্থায়ী হয় না; তাতে সুখ ত নাই-ই তৃপ্তিও নাই। রেবা মনে মনে বলিল—'তুমি আমায় হৃদয়হীনা বল্‌বে, কিন্তু আর ত উপায় নেই। তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাব;—আমায় ভুলে যেতে সুযোগ দেব; তা হ'লেই তুমি সুখী হবে। চোখের নেশা ফুরিয়ে গেলে, হয় ত, তুমি আমাকে ভুলেও যাবে।' অশনি তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, মনে করিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া

কাঁদিতে লাগিল। তিনি তেমন ভালবাসেন নি ত! যে ভালবাসায় সংসারের স্বার্থ ভুলিয়ে দেয়, এত ভালবাসা নয়! তাঁর চোখের বাহিরে গেলে, হয় ত, মনের বাইরেও চলে যাবো। রেবা ভাবিল এই না সে বলিতেছিল, প্রাণ ঢালিয়া সে অশনির মত ভালবাসিতে পারে নাই! এই দুর্বোধ্য মন লইয়া সে এখন কি করিবে? সে তাঁহাকে বন্ধনে ফেলিয়া দুঃখে ডুবাইবে? মায়ের কোল, সমাজের বক্ষ হইতে সে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া আনিবে? না! সে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প। তবু অশনি যে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, এ চিন্তা তাহার অসহ্য মনে হইতেছিল।

রেবার জীবনের সমস্ত সাধ, সব কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও তাহার সেই সঙ্গে ফুরাইয়াছে। অশনির প্রশ্নের সে উত্তর দিয়াছে। চিঠিতে লিখিয়া নয়; নিজের মুখেই সে জবাব দিয়াছে। সেই সঙ্গে অশনির সহিত তাহার সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। চিরজীবনের পাথেয়-রূপে সে যখন অশনির বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, অশনি রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'মাপ করো। যদি নিতান্তই তোমায় ভুলতে না পারি শত্রু বলে মনে করবো;—বন্ধু নয়।, উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস-গুলা বক্ষের বাহিরে আসিবার জন্য যখন বিদ্রোহে ঠেলাঠেলি লাগাইয়া শ্বাসরোধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল চোখের জল বন্ধ রাখা যখন দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছিল, তখন সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত হাসি-মুখেই সে বলিয়াছে; "সেই ভাল তোমার বন্ধুতার চেয়ে

শত্রুতাও আমার কাম্য। তুমি যে এমন হতে পার, তা আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারি নি, অশনি!" এ-কথার পরেও অশনি যখন একান্ত ব্যাকুলতার সহিত সকাতরে তাহার দুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিয়াছিল, "বল, কখনও কোন দিন—যত দীর্ঘ দিন পরেই তা আসুক্, কোন আশা আমি রাখবো কি না?" তখনও অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া রেবা বলিয়াছিল, "কালের জরিমানায় ধর্ম্ম কখনও ছোট হয় না; তোমায় আমি শ্রদ্ধা করতুম অশনি! সে টুকুও আমার থাকতে দাও। যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হয় না ও-সব পাগ্‌লামী বুদ্ধি ছেড়ে দাও। জানত তোমাদের শাস্ত্রই বলেচেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এ কথার পর "বেশ তাই হবে" বলিয়া সেই যে অশনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর আর সে রেবার কোন সংবাদ লয় নাই।

রেবার ইচ্ছা করিতেছিল, সে অশনির কাছে মাপ চাহিয়া বলে, সে মিথ্যাবাদিনী, তাই অবলীলায় অতবড় মিথ্যা বলিতে পারিয়াছে। সে তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে; সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। কিন্তু সে কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? সে যে দর্পনের প্রতিবিম্বের মতই অশনির মন দেখিতে পায়। একবার এতটুকু দুর্ব্বলতা জানাইলে, অশনি কি আর তাহাকে ত্যাগ করিতে চা'হবে! যত কঠিনই হউক, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে যাওয়া ছাড়া রেবার আর গতি নাই। সে

তাই যাইবে। খুড়ীমাকে সে বুঝাইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া কোথাও কোন কাজ সে খুঁজিয়া লইবে; নচেৎ বসিয়া থাইলে কয়দিন চলিবে? কুবেরের ভাণ্ডার ত তাহার নাই।

খুড়ীমা চোখে কাণে কম দেখেন ও শোনেন্ তবু যতটুকু বুঝিলেন, তাহাতে মনে করিলেন, বিদেশে কোথাও সরিয়া যাওয়াই ভাল। মেয়ের যেন দশদিনে দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সে সদানন্দময় বালিকা-ভাব আর নাই। চিন্তাশীলা যুবতী রাতারাতি মধ্যেই যেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা হইয়াছে। কেন যে এমন হইল, তাহার খবরও তিনি জানিতেন। সস্নেহে তিনি রেবাকে বুঝাইলেন, "কেন নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছিস্ মা! অশনিকে তুই কোন্ অপরাধে বিয়ে করতে চাইচিস্ নে?"

রেবা আজ তাহার একমাত্র আত্মীয়ের কাছে চোখের জল লুকাইতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "ও-কথা বোল না খুড়ী-মা! আমার জন্যে তিনি এত ছোট হ'য়ে যাবেন,—এ আমি সইতে পার্‌বো না!"

খুড়ী-মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তবে কল্‌কাতাতেই চল। এখানে আর টেক্‌বে কেমন করে! আহা বাছা অশনির মনেও এত ছিল!"

৪

রেবার উপর রাগ করিয়া অশনি কিছুদিন শূন্য বাড়ীখানাই আঁকড়াইয়া প'ড়িয়া রহিল; রেবার কোন সংবাদ লইল না। ক্রমে রাগটা কমিয়া আসিলে সে মনে করিল রেবা বোধ হয়, এইবার নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবে; পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইব। সে ত রেবাকে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। অশনির অবহেলা সহিয়া সে আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে? এমন রাগারাগি তাহাদের কতবারই ত হইয়াছে, কিন্তু রেবাই আগে সাধিয়া ভাব করিয়াছে। কোন দিনই অশনিকে সাধিতে হয় নাই। এবারই কি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। অসহ্য উৎকণ্ঠা বহন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। রেবার নিকট হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা বহন করিয়া কোন মূকবার্ত্তাবহই আসিল না।

একদিন সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়া অশনির মনে হইল, তাই ত এবারকার কলহের বিষয়টা ত ঠিক অন্যবারের মত নয়। যতই হোক বিবাহ-বিষয় লইয়া যখন গোল, তখন সে স্ত্রীলোক হইয়া আগে ক্ষমা চাহিবে কেমন করিয়া। নিজেকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া অশনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া নিজেই রেবার উদ্দেশ্যে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ীর বাহির না হইতেই দরোয়ান্ এক-

খানা পত্র অশনির হাতে দিল। হাতের লেখা দেখিয়াই অশনি বুঝিল চিটিখানি রেবার। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান ঝড়ের মুখে তৃণগাছির মত কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার অনুমান তবে ভ্রান্ত নয়। রেবা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছে। নির্ব্বোধ কেন সে মিথ্যা ঝোঁকে নিজেও কষ্ট পাইতেছে অশনিকে পীড়িত করিতেছে? ভগবানের ইচ্ছাই যদি ইহাতে নিহিত না থাকিবে, তবে কেন সে এমন করিয়া তাহার সমাজ-সংসারের বাহিরে একমাত্র অশনিকেই অবলম্বন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছিল? ভগবানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার তলে আছে বই কি!

অশনি ঘরে ফিরিয়া প্রথমে খামে-মোড়া চিঠিখানা মুঠি করিয়া করতলে ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। একেবারে খাম খানা খুলিয়া ভিতরের অপূর্ব্ব রহস্যটুকু উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে ভাবিল, ভাল খবর নিশ্চয়ই আছে—তবু—!

কাঁচি দিয়া খামের একাংশ সন্তর্পণে কাটিয়া ভিতরের ভাঁজ করা কাগজখানি বাহির করিয়া অশনি টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কিন্তু একি—! লেখা অল্পই; পড়িতে এক মিনিটও সময় লাগিল না। চিঠিখানা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া অশনি বিছানায় শুইয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা—

"অশনি! বিশেষ প্রয়োজনে আমার আজন্মের শত সুখ-দুঃখের

স্মৃতিমণ্ডিত প্রিয়তম কাশী ছাড়িয়া আজ আমি দূরান্তরে চলিলাম। জানি না, ভাগ্য আর কখনও আমায়, আমার জন্মভূমির কোলে ফিরাইয়া আনিবে কি না! ভাবিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; উচিতও ছিল তাই, কিন্তু সুবিধা হইল না। খুড়ী-মা ভাইয়ের কাছে লাহোরে থাকিবেন, অগত্যা আমারও তাই গতি। জীবনে অনেক অপরাধ তোমার কাছে করিয়া গেলাম। পার ত মাপ করিও। মনে করিও, রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ ছিল না। বিদায়—

রেবা।"

রেবা চলিয়া গেল? যাইবার সময় একটা মুখের কথা বলিয়াও গেল না! হৃদয়হীনা নারী! যাহার অশনির সহিত কথা কহিয়া কথা ফুরাইত না, চিঠি লিখিয়া কাগজে কুলাইত না, সেই রেবা এত শীঘ্র এমন পর হইয়া গেল! কি অপরাধ অশনি করিয়াছিল? রেবাকে ভালবাসিয়া সংসারের সকল ক্ষতি অম্লান-মুখে সহিতে চাহিয়াছিল, এই না তাহার অপরাধ? কিন্তু এ পলায়নে ত কোন প্রয়োজন ছিল না? তাহার আদেশেই যে অশনির নিকট যথেষ্ট। এতটুকু বিশ্বাসও সে আর রাখিতে পারিল না। অশনির দুই হাতের বদ্ধাঙ্গুলি, মুখের কঠোর ভাব, ললাটের কুঞ্চন-রেখা, তাহার অন্তর-যুদ্ধের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিক হয়েচে! সে পাষাণে প্রাণ সঁপিতে চাহিয়াছিল, এ তাহার যোগ্য প্রতিফল। রেবা তাহার কেহ নয়। রেবা

বলিয়া এ সংসারে কেহ তাহার ছিলও না। তবু অভিমানের দুর্ব্বল বাধা ঠেলিয়া অন্তরের দীন ক্রন্দন কেবলি কাঁদিয়া বলিতে থাকে, সেই যে তাহার সব। তাহার জন্য সে যে সকলি ছাড়িতে চাহিয়াছিল! চিরপ্রার্থিত মাতৃক্রোড় হইতে চ্যুত হইতেও সে যে ভয় করে নাই! তবে কেমন করিয়া সে মনে করিবে, সে তাহার কেহ নয়, কেহ ছিলও না? সে তাহার বন্ধু নয়, প্রিয় নয়, সম্বন্ধ নয়? অশনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন অশনি তাহার জ্যেঠা-মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিল, সে দেশে যাইতেছে। অতীন্দ্রবাবুর কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি নাই।

৫

সুদীর্ঘ দশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অশনিকান্ত ঘোষাল এখন আর কলেজের ছাত্র নয়। সে এখন একটা মহকুমার ছোট খাটো হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে ডেপুটী হইয়া দুই তিনটা মহকুমার জলবায়ু পরীক্ষান্তে সম্প্রতি বদলী হইয়া আরামবাগে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা। অশনী স্ত্রী-পুত্রদের একদিনও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; তাই জাহাজের বোটের মত তাহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে। অশনির স্ত্রী কনকলতা রূপসী না হইলেও প্রকারান্তরে নামের স্বার্থকতা দেখাইয়াছিল। ধনী-কন্যা স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যধিক আদরে

বঞ্চিত হওয়ায়, নিজেকে সংসারের কোন উপকারে লাগিবার উপযোগী করিয়া গড়িতে ত পারেই নাই; বরং সেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের কাছে উপকার লইতেই শিখিয়াছিল। তাহার উপর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর গুণে তাহার স্বাস্থ্যও ক্রমে খারাপ হইতে ছিল। সম্প্রতি সে সন্তান-সম্ভাবিতা। অশনি স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে বলকারক পথ্য এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়া "প্রসূতি-রক্ষক" নানাবিধ 'টনিক' 'পিল' গিলাইয়াও তাহার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল-সঞ্চার করিতে পারিল না। কাশীতে মাতা এবং কলিকাতায় শ্বশুর কনককে লইয়া যাইতে চাহিলে, কেন যে তাহাকে পাঠায় নাই, তাহা ভাবিয়া অশনি এখন মনে মনে নিজের বিবেচনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতেছিল। কিন্তু এখন আর সে সময় যে নাই!

ব্যাঘ্র-ভীতি-সঙ্কুল স্থলে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসার নীতি-অনুসারে দুইদিন প্রসব-বেদনা-ভোগে কনকলতার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছিল। এখানকার একমাত্র শিক্ষিতা ধাত্রীটিও এই সময় সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগতা। ডাক্তার কহিলেন, "আর এক উপায় আছে। মিস্ গুহার ধাত্রী-বিদ্যা চমৎকার! তিনি ব্যবসাদার ধাত্রী ন'ন বটে, কিন্তু ভারী হাত-যশ। একবার যদি তাঁকে কোন রকমে আন্‌তে পারা যেত! তাঁরও শরীর ভাল নয়; কিন্তু দরকারের সময় নিজের অসুখ বিসুখ কিছুই তাঁর মনে থাকে না। তবে ঐ ভারী দোষ!—যাদের পয়সা দেবার সামর্থ্য আছে, তাদের কাজে বা'র ক'রে আনাই কঠিন।"

আরদালী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, লেডী ডাক্তারের শরীর অসুস্থ, তিনি আসিতে অসমর্থ।

বিপদের সময় মানাপমান দেখিতে গেলে চলে না। অশনি চটি জুতায় পা লাগাইয়া সার্টের বোতাম না আঁটিয়াই ধাত্রীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া যেমন করিয়াই হউক্ তাঁহাকে লইয়া আসিবে। নইলে কনককে যে বাঁচান যাইবে না।

মাননীয় অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় অগত্যাই মিস্ গুহাকে বাহিরে আসিতে হইল। দশ বৎসরের পর দেখা। কালের হস্তক্ষেপে আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তবু পরস্পরকে চিনিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এ অতর্কিত সাক্ষাতের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না; তাই কিছুক্ষণ দুই জনকেই চুপ করিয়া মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অশনির প্রয়োজন অধিক; শীঘ্রই সে আত্মস্থ হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত অভিবাদন করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—"সদাশয়া মিস্ গুহের অনুগ্রহের উপর তাহার জীবনের সুখ নির্ভর করিতেছে। তাহার স্ত্রীর জীবন-রক্ষা না করিলে, শুধু দুইটা নয়, তিনটা প্রাণীরই মৃত্যু-সম্ভাবনা। রেবার মনে পড়িল আর একদিন অশনি এমনি করিয়াই তাহার কাছে কাতর-প্রার্থনায় জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিল;—বলিয়াছিল, "তুমি ত্যাগ করলে আমি বাঁচ্‌ব না।" সে অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল, "ঈশ্বরকে জানান্;—আমার দ্বারা চেষ্টার কোনও ত্রুটী হ'বে না।—চলুন্।"

৬

সারা-রাত্রি অত্যন্ত গোলমালের পর সকালের দিকে বাড়ীখানা ঘুমন্ত পুরীর মত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রসূতির খবর পাইয়া অশনির মা এবং কনকলতার বাপ আগের রাত্রেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। ছেলেমেয়েগুলির ঝঞ্ঝাট পোহানয় মুক্তি পাইয়া অশনি এইবার হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

দারুণ কষ্ট ভোগের পর মৃত-পুত্র প্রসব করিয়া রক্তহীন কনকের জীবনী শক্তি আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, "কৃত্রিম উপায়ে অন্যের দেহ হইতে রোগীর দেহে রক্ত-প্রদান ভিন্ন প্রসূতির জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই।" শাশুড়ী, স্বামী এবং বুড়া বাপ প্রমাদ গণিলেন। যথেষ্ট পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াও অশনি রক্ত দিবার জন্য লোক সংগ্রহ করিতে পারিল না। বাপ্‌রে! পয়সার জন্য গায়ের রক্ত কে দিবে। অশনি যুবাপুরুষ দেহও তাহার সুস্থ, কিন্তু হইলে কি হয়, কাটা-ফোঁড়ায় যে তাহার বড় ভয়। রক্ত দেখিলে তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, মূর্চ্ছা আসে, এমন দুঃসাহসিকতা তাহার দ্বারা সম্ভব নয়। ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন উপায় নাই?" ডাক্তার কহিলেন, "না।" সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রেবা কহিল, "ডাক্তারবাবু, আপনি প্রস্তুত হোন্। আর দেরী হ'লে ও'কে রাখ্‌তে পারবেন না। রক্ত আমি দেব।"

অশনি ক্ষোদিত-মূর্ত্তির মত রেবার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! বাধা দিবার কথা পর্য্যন্ত মনে আসিল না। ডাক্তার কহিলেন "মিস্ গুহ, আমায় মাপ কর। তোমায় আমি নিজের মেয়ের মত মনে করি! তোমার প্রাণ যে কত দামী, তা আমার চেয়ে কেউ বেশী জান্‌বে না। তোমার যা শরীর, তাতে যে পরিশ্রম তুমি গরীব দুঃখী, পরের জন্যে কর, তাই ঢের—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "ওঁকে বাঁচাতেই হবে, আমি কথা দিয়েচি। ডাক্তার বাবু, আপনার পায়ে পড়ি—আমার চেষ্টার ত্রুটিতে যেন কোন দুর্ঘটনা না হয়। আমার সত্য রক্ষা কর্‌তে দিন।"

অনেক বাত-বিতণ্ডার পর রেবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অগত্যাই ডাক্তারকে সম্মত হইতে হইল। সহৃশীলা রেবা শান্তভাবে ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে আত্মসমর্পণ করিলে, অশনি কক্ষ হইতে পলাইয়া গেল। মা বাহিরে "হরির তলায়" মাথা কুটিয়া সেই অনাচার দুষ্টা অসমসাহসীক-নারীর সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট জরিমানা "মানস" করিয়া দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের অনুমান ভুল হয় নাই! নূতন শোণিত-সংগ্রহে কনকের জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিল।

ডাক্তারের আদেশে রেবা এখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠা-বসা

করিতে পার না। ডান হাতের যে শিরা ছেদন করিয়া রক্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ক্ষত অনেকটাই পূরিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা এখনও সারে নাই। মা ছেলেপুলে, রোগী এবং সংসারের ঝঞ্ঝাট্ মিটাইয়া অবসর পাইলেই রেবার কাছে আসিয়া বসেন। কখন তাহার গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দিয়া বলেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ রেবা, আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করবি না। বাবা! ধন্যি মেয়ে তুই! মনে করলেও গা শিউরে ওঠে গা। রেবা তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসে। রেবা বাড়ী যাইতে চাহিলে অশনির মা কহিলেন, "তা কি হয়? আগে ভাল ক'রে সেরে উঠ্। যে তোর শরীরে যত্ন বাছা! বাড়ীতে কেবা দেখ্বে, কেবা যত্ন কর্বে? খুড়ীটিও ত নেই! তাই ত বলি, বিয়ে কর্লে এদ্দিনে এক ঘর ছেলেপুলে হোত! কি যে ধিঙ্গি হ'য়ে রইলি! এখানে ত আর জলে পড়িস্ নি! এও তো তোর নিজের ঘর।"

মার মুখের পানে চাহিয়া রেবার আবার অতীত জীবন মনে পড়িতেছিল। সেই অনাবিল আনন্দের নির্ঝর সুদূর অতীত! কি মধুর তাহার স্মৃতি! রেবার জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না। মনে পড়ে, অশনির সহিত একত্র খেলা-ধুলা—একত্র বিদ্যা-শিক্ষা—মায়ের কোল, মায়ের স্নেহ! একবৃন্তে, ভিন্নজাতি দুইটি ফুল কি শোভনীয় মাধুর্য্যেই তাহারা ফুটিয়াছিল। সে সব সুখের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

দুপুরবেলা একা বিছানায় পড়িয়া রেবার কর্ম্মহীন দীর্ঘদিন কিছুতেই আজ যেন আর কাটিতেছিল না। হয়ত কনক এখন একা বিছানায় পড়িয়া তাহারই মত এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিন কাটাইতেছে! অশনি এ সময় কাছারীতে বদ্ধ থাকে, তাই কনকের ঘরে যাইবার অদম্য লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। চলিতে এখনও পা টলিতেছিল, তবুও সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। মা অশনির ছেলে মেয়েদের লইয়া বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়াছেন। উঠানে শ্যামার মা বাসন মাজিতেছিল, অন্য ঝি-চাকরেরা দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের আশায় কে কোথায় গিয়াছে!

কনকের ঘরে যাইতে গিয়া সহসা অশনির কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া, রেবা বাহিরেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজ বেশী না থাকায় অশনি সে-দিন হাঁটিয়া সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছে। তাই রেবা তাহার ফিরিয়া আসার খবর জানিতে পারে নাই। রেবা শুনিল, কনকের কথার উত্তরে অশনি বলিতেছিল, "মা বুঝি গল্প কর্‌বার আর লোক পান্‌ নি!—ও একটা ছোটবেলার পাগ্‌লামী! এখন মনে হ'লেও ভয় হয়। ওঃ! কি রক্ষেই পাওয়া গেছে!" স্বামীর আদরে গলিয়া কনক আদরের সুরে কহিল, "রক্ষেটা কিসের শুনি? অমন সুন্দরী, বিদুষী, কত সেবা-যত্ন জানে!" পত্নীর রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া, আদরের টান দিয়া অশনি কহিল, "থামুন পাদ্‌রীমশাই। আর বক্তৃতা দিতে হবে না। জানেন ত হিঁদুর বিয়ে এক জন্মের নয়! তুমিই যখন আমার জন্ম-

জন্মান্তরের স্ত্রী, তখন মুখ্যুই হও, আর কুচ্ছিৎই হও, তোমায় যে আমায় পেতেই হোত! ও আমার কে? কেউ না—”

রেবা নিঃশব্দে আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। বুঝি, এত দিন এই কথা শুনিবার জন্যই মন তাহার মনের ভিতর তৃষিত হইয়াছিল। অশনির মঙ্গল-কামনায় সে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যে যথার্থ ই অশনির মঙ্গল ক্রয় করিতে পারিয়াছে কি না—এ সন্দেহের অনুতাপ দশবৎসর ধরিয়া তাহার বুকে তুষানলের মতই ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। কতদিন মনে হইয়াছে, হয় ত হৃদয়ের সে গভীর ক্ষত কালেও মিলাইতে পারে নাই। না; সে ক্ষত ত নহেই; শুধু সামান্য আঁচড়ের দাগমাত্রও সে নয়। সে তাহার প্রিয়তমের দুঃখের হেতু নয়;—তাঁহাকে মাতৃক্রোড়, আজন্মের বিশ্বাস, সমাজ, পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম হইতে নিজের স্বার্থের সুখের মধ্যে টানিয়া না আনিয়া তবে ত ভালই করিয়াছে। মেঘ যেমন বজ্রাগ্নি বক্ষে ধরিয়া ও ধরণীর তপ্ত বক্ষকে জলধারায় সিক্ত করিয়া দেয়, সে তাহার প্রিয়তমের জীবনও তেমনি করিয়াই শীতল করিতে পারিয়াছে।

রেবা মাটীতে বসিয়া দুই হাত যোড় করিয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধায় ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিল।—“প্রভু! স্বামি! পিতা! শুধু তাঁকে নয়, আমাকেও তুমি রক্ষা করেছ!—তোমার করুণাময় নাম সত্য!”

ভাবের অভিব্যক্তি

গল্পটি বেশ জমিয়া আসিতেছিল। নাট্য জগতের ছোট বড় সমস্ত খ্যাত ও অখ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীই একে একে এই গল্পের মধ্যে স্থান পাইতেছিলেন। কে কখন কি ভাবে যশের উচ্চ-শিখরে আরোহণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, উপস্থিত তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ চলিতেছিল।

রমেশ বলিল—"ভাবের অভিব্যক্তিতে অচলেন্দু কি ক'রে এত-খানি দখল নিয়ে আজ দেশের মধ্যে সর্ব্বোত্তম অভিনেতার নাম নিতে পেরেচে, সে সম্বন্ধে তোমরা বোধ হয় বিশেষ কিছু জান না, তারই কিছু বল্‌ব। অচলেন্দু আর আমি তখন আমরা দুজনেই নাট্যকলা শেখ্‌বার জন্যে অসীম অধ্যবসায়ে কাজে লেগেছিলাম। আমাদের তখন কেউ জান্‌তও না পুঁচ্‌তও না। নগণ্য চুনোপুঁটির দলেই আমরা প'ড়েছিলাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে একটা মেসে থাক্‌তাম। যে, যে কাজে নীচে থেকে খুব উঁচুতে উঠ্‌তে পারে, তার কিছু লক্ষণ বোধ হয় গোড়া থেকেই তা'তে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম যখন অচলেন্দুকে খুব ছোট ছোট পার্ট দেওয়া হোত তার মধ্যেও একটু বিশেষত্ব সে দেখাতে পার্‌ত। সে পরিশ্রমীও খুব ছিল। যখন তাকে কেউ চিন্‌ত না, তখনও সে যেমন ছিল, এখন যে মাসে সে হাজার টাকা উপায় ক'চ্চে, এখনও

তার স্বভাব ঠিক্ তেমনই আছে। "ওরিয়েণ্টাল" থিয়েটারের অবস্থা তখন খুব খারাপ যাচ্ছিল। দর্শক হোতই না। সবাই ভাব্‌ছিল থিয়েটারটি এইবার উঠে যাবে, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ অচলেন্দুর একদিনের একটি অভিনয়ে থিয়েটারের, আর তা'র নিজেরও ভাগ্য ফিরে গেল। নাটকের বিষয়টি ছিল অতি সামান্য! পুলিশ স্ত্রী হত্যাকারী সন্দেহে হতা নারীর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে, বেচারা স্বামীটি কিন্তু সম্পূর্ণই নিরপরাধ!

অচলেন্দু সে নাটকখানিতে স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিল। নিরপরাধ স্বামীর, গ্রেপ্তারের পর যে মুখের ভাব সে প্রকাশ করেছিল, সেই আশ্চর্য্য, ভয়, বিস্ময় ও দুঃখাশ্রিত যে অদ্ভুত ভাব সত্যের চেয়েও সজীব ভাবে, সে দর্শকের চোখের উপর প্রকাশ কর্‌তে পেরেছিল, সেইটিতেই তা'র ভাগ্য ফিরে গেছ্‌ল। কিন্তু আমি জানি, এই ভাব সংগ্রহে তা'কে বড় অল্প চেষ্টা ক'র্‌তে হয়নি। সেই গল্পই আজ বল্‌ব।

ভূমিকা গ্রহণ ক'রে পর্য্যন্ত বেচারীর আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড় হ'য়েছিল। রাত্রে প্রায়ই দেখ্‌তেম, সে ঘুরে বেড়াচ্চে। হয় ত সারারাতই সে এম্‌নি ঘুরে বেড়াত। তিন চার দিনে তার চেহারা যে রকম খারাপ হ'য়ে গেছ্‌ল, তাকে দেখ্‌লে ভয় হোত। একদিন রিহার্সাল থেকে ফিরে সে হতাশভাবে ব'ল্লে—'রমেশ, আমার আশা ভরসা সবই শেষ হ'য়ে গেল, আমা দ্বারা এ ভূমিকার অভিনয় হবে না।' আমি অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম,

'ব্যাপারটা কি বল দেখি, দিনরাত খাট্‌চ, এত ভাব্‌চ, হবে নাই বা কেন ?' সে জবাব দিলে, 'খাট্‌লেই যদি হোত, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। যখন ছোট-খাট পালাগুলো করতাম, কত রকম ভাব আপনিই মুখে আস্‌ত, কিন্তু এ হতভাগা পালাটার নায়ক ক'রে আমায় পাগল ক'রে দিয়েচে !' কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের বড় আর্শিখানার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি করতে করতে বল্লে, 'দেখ দেখি, এ মুখ কি খুনী অপরাধে অভিযুক্ত কোন নিরপরাধীর মুখের মত দেখাচ্চে ? ও মুখ দেখে লোকে গায়ে ধুলো দেবে না, ছিঃ ছিঃ করবে না কি ?'

আমার কিন্তু তার অভিনয় বেশ ভালই লাগ্‌ছিল। তার পাগলামীতে বাধা দেবার জন্যে বল্লাম, 'কোথায় দোষ আছে ? বেশই ত হ'চ্চে।'

ক্ষোভে দুঃখে তার গলা পর্যান্ত বুজে আস্‌ছিল ; সে দুঃখের চাপাহাসি হেসে জবাব দিলে, 'কোথায় ভুল হচ্চে ? সবই ত ভুল চিড়িয়াখানার পোষা বানরকে একটা কলা খেতে দিয়ে কেড়ে নিলে তার যে রকম মুখের ভাব হয়, এ যে তেমনও হ'চ্ছে না। ম্যানেজার যদি আমায় অন্য ভূমিকা দিত, তা'হলে আমি বেঁচে যেতুম ; এ যেন আমার কান্না পাচ্চে।'

আর্শির সামনে আরও খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন-চেষ্টায় বিফলকাম হ'য়ে সে হতাশভাবে তক্তপোষের উপর ব'সে প'ড়্‌ল।

আমি বল্লাম, 'এই মাত্র রিহার্শাল থেকে ফির্‌চ! এখন খানিক আগে জিরও, তারপর যা হয় কোর।'

সে বললে, 'জিরব কি ক'রে? পোড়া চোখে কি ঘুম আছে!'

আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বল্লাম, 'সাধ্য থাক্‌লে আমি তোমায় সাহায্য কর্‌তাম, কিন্তু কি কর্‌ব ভাই, তোমার মত আমার ত প্রতিভা নেই।'

আমিও একবার আর্শির কাছে দাঁড়িয়ে মুখে দুঃখের ভাব আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম।

অচলেন্দু দুঃখের হাসি হেসে ব'ল্লে, 'থাক্‌, ও আর কেন? যে ভাব তুমি দেখাচ্চ আর যা আমি দেখালেম, দর্শকদের কাছে যখন এই ভাব দেখাব, তখন তারা হয় হেসে লুটোপুটি খাবে, নয় মনে কর্‌বে আমাদের হজমের গোল ঘটেচে। কাজ নেই ভাই, ক্ষমা দাও।'

আমি তার কথা শুনে হেসে উঠ্‌তে, সেও ক্ষীণভাবে তাতে যোগদান ক'ল্লে। তারপর দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম, ঘরের ভিতরে বাতির আলোটা বাতাসে কাঁপ্‌ছিল; আর তা'র সঙ্গে আমাদের বিকৃত ছায়া দুটোও দেয়ালের গায়ে নাচ্‌ছিল। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমার ভাবনা হ'চ্ছিল, কি উপায় এর করা যেতে পারে। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হওয়ায়, আমি লাফিয়ে উঠ্‌লাম। তাড়াতাড়ি বন্ধুর পিঠে একটা থাব্‌ড়া মেরে 'বলে উঠ্‌লাম, 'হ'য়েচে ভাই হ'য়েচে। একটা মতলব বেরিয়েচে!'

সে আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্লে, 'কি হ'য়েচে?' আমি বল্লাম, 'অব্যর্থ উপায়—যাতে তোমার ঠিক্ কাজ হবে, যেমন মুখের ভাব তুমি চাইচ, তারই আদর্শ মিলে যাবে।'

সে অবিশ্বাসের হাসি হেসে ব'ল্লে, 'যা বল্‌বার ব'লে ফেল, কিন্তু অল্প কথায়, বেশী সময় নিও না।'

আমি মনে মনে হাসলাম, আমার মাথায় যে খেয়াল চেপেছিল, তার সার্থকতার সম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধা আসেনি। উত্তেজনা ও আনন্দাতিশয্যে আমার গলা যেন জোরে আস্‌ছিল। যথাসাধ্য সংযতভাবেই আমি বল্লাম, 'গঙ্গাধরের কথা তোমায় যা' ব'লেছিলাম মনে আছে ত? সেদিনকার সেই লোকটা—'

'কোন লোকটা? যা'কে সেদিন পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে কাপড় চোপড় দিয়ে সুস্থ ক'রে ছেড়ে দিলে, তা'র কথা বল্‌চ?'

'হাঁ, সেই—তাকে ছেড়ে ঠিক্ দিইনি, কাকার দোকানে তাকে চাক্‌রী একটা জুটিয়ে দিয়েচি। খিদিরপুরে একটা বস্তিতে একখানা খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে—তার ঠিকানাও আমি জানি। লোকটা ভারী অল্পে উত্তেজিত হয়ে উঠে,—অত্যন্ত নার্‌ভাস। চল, আমরা দুজনে পুলিশ সেজে আজ রাত্তিরেই তার বাসায় গিয়ে হাজির হই।'

'আর আমার ভূমিকার নায়কের স্থলাভিষিক্ত ক'রে তাকে খুনী ব'লে গ্রেপ্তার করি,—কেমন, এইত ব'ল্‌চ?

সে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল 'ব্র্যাভো! চমৎকার প্লান্‌ বার করেচ। যেমন সহজ, তেমনি সুন্দর! একটু দেরী নয়, চল! এখনি মতলবটা টাট্‌কা টাট্‌কা খাটাবার চেষ্টা দেখা যাক্‌।' তাড়াতাড়ি পকেট্‌ থেকে ঘড়ি বার করে সে বল্‌লে,—'দশটা বাজলো। একখানা ভাল গাড়ী নিলে আধ ঘণ্টার ভেতর আমরা গিয়ে পৌঁছুব?'

আমি বল্‌লাম,—'এত তাড়াতাড়ি কি? কালই হবে এখন?'

সে বল্‌লে,—'না ভাই—লোহা লাল থাকতে থাকতেই তাকে পেটা ভাল। কি জানি, অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে সে যদি কালই বাসা বদলায়! তা ছাড়া তোমার এই মতলবের ফল না দেখে আমার যে চোখে এককোঁটা ঘুমও আস্‌বে না ছাই। আচ্ছা মতলব বার করেচ কিন্তু! নাটকীয় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, সত্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ! তার বাড়ীতে গিয়ে মাঝরাত্রে ঢোকা, দরজায় ধাক্কা দেওয়া, তারপর ওয়ারেণ্ট বার ক'রে দেখান। ওহো, আগে দেখা যাক্‌, ওয়ারেণ্টের মত ধরণের কাগজ কিছু ডেস্কে পাওয়া যায় কি না। ওয়ারেণ্ট দেখেই লোকটার হতাশ ভাব, তার সাশ্চর্য্য দৃষ্টি, তার মুখে ভয়-ভাবনা-বেদনার মিশ্রিত ভাব, আমি যেন চোখের উপর ম্যাক্‌বেথের ভূতের দৃশ্যের মত একের পর এক স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি! আর এক মিনিটও দেরী করা নয় রমেশ, চল একখানা গাড়ীর চেষ্টা দেখা যাক্‌। এই যে এই নীল কাগজটাকে ওয়ারেণ্ট ব'লে চালান যাবে।'

আমি একটু ভেবে বল্‌লাম, 'কাজটা কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত।

আর বে-আইনী হবে। একটা নির্দোষ মানুষকে খুনী ব'লে ওয়ারেণ্টের ভয় দেখাতে যাওয়া নেহাৎ তামাসার ব্যাপারও ত নয়! অবশ্য সে বেচারী এখন দুঃখে পড়েচে এই যা' ভরসা। যাতে বকসিস্ টক্‌সিস্ দিয়ে পরে তা'কে শান্ত কর্‌তে পারা যেতে পারে, তার একটা উপায় কর্‌তে হবে।'

অচলেন্দু বললে, 'নিশ্চয়ই,—তা' কর্‌ব বই কি। আমি গরীব মানুষ, বেশী ত পার্‌ব না, তবে আজ রাত্রে তা'কে দশটি টাকা দেব। আর থিয়েটারের চারখানা টিকিট দেব। সে যখন সব শুনবে, নাট্যকলার উৎকর্ষের জন্যে, আমাদের এ চেষ্টায় খুব বেশী রাগ কর্‌তে পার্‌বেও না।'

আমি বললাম,—'বেশ, কিন্তু আর দেরী করা নয়, তাহ'লে হয় ত আমি এ কাজে সাহায্য কর্‌তে পারব না। কারণ মতলবটা বার ক'রে এখন মনে মনে আমার লজ্জাই হ'চ্চে।'

সে আমার কথায় কাণও দিলে না। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একটা দাড়ী গোঁপ বার ক'রে মুখে আঁটতে লেগে গেল। আমায় বললে,—'রমেশ, শীগ্‌গির হাত চালিয়ে চেহারা ফিরিয়ে নাও। ইউনিফর্মের দরকার নেই, এসব কাজে ডিটেক্‌টিভেরা সাদা কাপড়েই কাজ ক'রে থাকে;—তা ছাড়া এই রাত্রে বস্তিতে গিয়ে পুলিশের পোষাকে হৈ চৈ কর্‌তে আমার সাহস হয় না। বাঃ, দাড়ী প'রেই তোমায় খাসা গম্ভীর ভারিক্কি চেহারা দেখাচ্চে। আর কিছুর দরকারও নেই, চল।''

'তা'র কথা বা কাজে বাধা দেবার বা অসম্মতি প্রকাশের সময় বা ইচ্ছা কিছুই যেন তখন আমার ছিল না। তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। গাড়ীতে উঠে কে কি কর্‌ব ঠিক ক'রে নিলাম। আমিই ওয়ারেণ্ট ধরান, কথাবার্ত্তা কওয়া সব কর্‌ব। আর সে পাশে দাঁড়িয়ে তার ঈপ্সিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বে। কথা শেষ হ'তে হতেই আমরা খিদিরপুরে এসে পৌছুলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি এসে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। গরীব পল্লী। তখনও কেউ বাড়ী ফির্‌চে। খবর নিয়ে জান্‌লাম, সে এই অল্পক্ষণ মাত্র বাসায় ফিরেচে। জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে "মাট্"-কোঠা"র একখানি জীর্ণ ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। একখানা বাড়ীতে অনেকগুলি ভাড়াটে, অধিকাংশ ঘরই বন্ধ! সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে। সাড়াশব্দ বেশী না ক'রে আমরা সরাসর তার ঘরের কাছেই এসে দাঁড়ালাম। দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমার একবার বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠেছিল। এই ঘুমন্ত রাতে, সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বেচারা এইবার বিশ্রামের অবসর পেয়েচে। হয় ত ক্লান্তিতে চোখের পাতা এত-ক্ষণ বুজে গিয়ে থাক্‌বে। হয় ত বা চেষ্টা ক'রে খাবার জোগাড়ও সে করে নি, না খেয়েই ঘুমিয়ে প'ড়েচে। এমন সময় এমন ক'রে অতর্কিত আঘাত! চুপি চুপি অচলেন্দুকে বললাম,—'চল, ফিরে যাই—এখনও সময় আছে—কাজ নেই ভাই—' অন্ধকারে বজ্র-মুষ্টিতে সে আমার ডান হাতখানা সজোরে চেপে ধর্‌লে, ক্রোধ-

বিকৃতস্বরে উত্তর দিলে,—"অসম্ভব! এখন তুমি ফিরতে পার— আমার ফেরবার উপায় নেই। ভেবে দেখ, মিনিট দুইয়ের অপেক্ষা, আমিও তার মুখের ভাবটি মনে এঁকে নেব, সেও দশ টাকার নোটখান বাকসে তুলবে। বাধা দিও না, এগোও।"

যে বৈদ্যুতিক শক্তির বলে ভারতবর্ষ-ব্যাপী দর্শককে এখনও সে আকর্ষণ করতে পারচে, সে শক্তির অঙ্কুর তখনও হয়ত তার ভেতরে উপ্ত হ'য়েই ছিল। তা'র মত বদল করতে আমার শক্তি হোল না। আমি তার ইচ্ছার হাতে যন্ত্রের পুতুলের মতই নিজেকে চালিয়ে দিলাম। দোর বন্ধই ছিল। আমরা একবার জোরে ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে চাপা স্বরে আওয়াজ এল, 'কে? এত-রাত্রে কে তোমরা—কি চাও?' আমি গম্ভীর স্বরে বললেম,— আইনের দোহাই দরজা খোল। আস্তে আস্তে দরজার হুড়্‌ক-খোলা শব্দ পেলাম। ঘরে আলো ছিল। সে তখনও আমা খোলেনি, দোর খুলে একটু পাশে স'রে দাঁড়াল। আমা ঘরে ঢুকলাম, সে অবাক হ'য়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। আমি সে সময়েও অচলেন্দুর মুখের দিকে না চেয়ে পারলাম না। শিকারঃ বিড়াল যেমন ক'রে অসতর্ক ইঁদুরের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে সে তখন তার শিকারের পানে চেয়েছিল। তা'র মুখের প্রত্যেক আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনটিও যেন তার চোক থেকে এড়িয়ে না যায়, এমনি একটি সতর্ক সাবধনতার ভাব যেন তার মুখে ফুটে উঠেছিল।

ওয়ারেণ্টখানা পকেট থেকে বার ক'রে তার সামনে ধ'রে

বল্লাম, 'আমি পুলিশের কর্ম্মচারী। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোককে খুন করার অপরাধে তোমায় আমি রাজার হুকুমে গ্রেপ্তার করলাম।'

মুহূর্ত্তমধ্যে তা'র মুখের অদ্ভুত ভাব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। একবার দরজার দিকে, একবার জানলার দিকে তার চোখ ঘুরে এল। পলায়নেচ্ছু পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মত চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠ্ল। চিত্রকর কোনও দৃশ্য আঁকবার পূর্ব্বে যেমন ক'রে তার আদর্শের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে থাকে, অচলেন্দ্র তেমনি করেই তার সাম্নের অভিযুক্ত আসামীর পানে চেয়ে দেখ্-ছিল। তারপর আচম্বিতে যে ঘটনা ঘট্ল, তাতে বিস্ময়ে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্ল। আজ পর্য্যন্ত তা'র সেই হতাশের সুর আমার কাণে বাজ্চে,—এখনও যেন আমি সে স্বর শুনতে পাচ্চি। সে বলে উঠলো, 'সব শেষ,—সব শেষ,— আমার আশা ভরসা আর কিছু নেই! যা' তোমরা বল্চ, আমি সবই স্বীকার করচি। আমাকে কি করে যে তোমরা খুঁজে বার করলে, তা আমি জানি না—জান্তে চাইও না।'

সে তার মাথার কৃত্রিম চুল আর দাড়ীগুলি একটানে খুলে ফেলে দিলে। আমরা সাশ্চর্য্যে দেখ্লাম সে মূর্ত্তি খুব অপরিচিত নয়—তার ফটো থানায় থানায় অনেক জায়গায়ই এঁটে দেওয়া হ'য়েছিল। তিন হপ্তা আগে সে তা'র স্ত্রীকে খুন ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছ্ল। গঙ্গাধর তার আসল নাম নয়,—তার নাম হরকান্ত মাইতি।

হরকান্ত তার নিজের কাহিনী বলেছিল। সে বলেছিল,—'আপনারা জেনেছেন আমি খুনী, আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেচি কিন্তু কেন যে করেচি, মানুষ হয়ে মানুষের বুকে,—একদিন যা'কে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবেসে ছিলাম,—তা'র বুকে কেমন করে যে ছুরী মেরেছিলাম, কত বড় আঘাতে, কতখানি যন্ত্রণায় যে মানুষ দানব হয়, তা আমি জানতে চাইচি না। তবে তাকে নিজের হাতে মেরে—আমি যে অনুতপ্ত হই নি, এ কথা এখন ও বলতে পারি। এখানে আর এখানকার উপরকার যে আদালতেই আমার বিচার হোক, আমি হাসিমুখেই সে দণ্ড নেব। তবু নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করব না। আমি তৈরী হ'য়েই আছি—মরতে আমার ভয় নেই—ফাঁসীতে কেবল ভয় ক'রেছিলাম। অপরাধীকে দণ্ড দিয়েচ, তাতে দুঃখ নাই। যাক্, মানুষ মারার যে পাপ, তার শাস্তি হ'য়েই যাক—চলুন, কোথায় যেতে হবে চলুন।' সে অগ্রসর হয়—আমি অচলেন্দুর পানে চেয়ে দেখলেম। এতবড় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারেও সে সমান অবিচলিত ভাবে তার আদর্শ সংগ্রহ করে নিচ্ছিল। একটি কথাও সে বলেনি। এতটুকু আশ্চর্য্যভাবও দেখায় নি। শেষ পর্য্যন্ত সে যেন কেবল চোক্ দিয়েই ঘটনাটিকে গ্রাস কচ্ছিল। নাট্যকলাই ছিল তার প্রাণ—মনুষ্যত্ব তার নীচে। প্রতারিত স্বামীর নিজমুখে স্বীকারোক্তি তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ,—শুধু "বিরজা" নাটকে নয় "ওথেলো" নাট্যাভিনয়েও তার যশের

সিংহদ্বার মুক্ত ক'রে দিয়েছিল। সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ কিন্তু তা থেকেই আজ প্রকাণ্ড মহীরুহের উৎপত্তি করেচে।

"ওরিএণ্টাল" থিয়াটারে অচলেন্দু নায়ক "বিকাশে"র পাঠ নিয়ে প্রথম দিনেই সে আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখিয়েছিল, তাতে দর্শকদের শুধু মুগ্ধ করা নয় একেবারে কিনেই ফেলেছিল সেই এক রাত্রের অভিনয়ে টলটলায়মান রঙ্গভূমি আর তার গরীব অভিনেতা দু-এরই ভাগ্য পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছ্ল। উপর্য্যুপরি প্রতি শনিবার ঐ একই নাটকের অভিনয়, আর একই প্রকার লোক সমাগম চল্‌ছিল। থিয়েটারে লোকের স্থান সংকুলন হয় না। পুলিশ দিয়ে ভিড় কমাতে হয়, বেলা দু'টো না বাজতেই টিকিট-ঘরের সাম্‌নে অভিনয়-দর্শনেচ্ছু লোকের ভীড় জম্‌তে থাকে। সেই একটি মাত্র দৃশ্যে "পুলিশ কর্ত্তৃক স্ত্রীহত্যাকারী বিকাশের গ্রেপ্তার দৃশ্যে" অভিনয়ের সকল ত্রুটিই সেরে নিয়েছিল। অভিনেতার আশ্চর্য্য স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশের দক্ষতা মুখে মুখে সংবাদপত্রে দেশব্যাপী জয়গানে ভ'রে উঠেছিল।

যে অভাগা নিজের দুর্ভাগ্য দিয়ে অচলেন্দুর ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে, বিচারক তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম দিয়াছিলেন। সে তার দুর্ব্বহ জীবন বইতে পারছিল না ব'লে ফাঁসিকেই কিন্তু কামনা করেছিল।

গল্প শেষ করিয়া ধূমমলিন রাজপথের দিকে তাকাইয়া একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, "আজ এইখানেই উপসংহার করা যাক্। ভাবের অভিব্যক্তির বিষয়ে আরো কিছু আমার বল্‌বার ছিল। কিন্তু আজ আর নয়—বারান্তরে।"

———

লেখকের বিপত্তি

১

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস "মৃগতৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র অতুলনীয়—নারীচরিত্র-চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহ্যশক্তি, ধৈর্য্য অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কাপিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

লেখকের বিপত্তি

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত-সমাজে সম্মানের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু-না কিছু বাহির হইতেছেই। বাঙ্গলা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয় মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজকর্ম্ম যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন।—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কিনা। যেবার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাদিগের কাছে শুধু নীরসই নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদেরই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবস্থ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা সম্পাদকের অবস্থা বড় কম শোচনীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ্ দিয়া অনুরোধ জানাইও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না।

বই ছাপা লইয়া "পাব্‌লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান! যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি, ইহারই সাধনায় তাঁহার স্নানাহারে সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। বাহিরের সৌন্দর্য্যের সাথে তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতাগুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝলমলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের পর দুই বৎসর বড় সুখেই তাদের দাম্পত্য জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী বুঝি শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব, অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পদেই উৎসর্গ করিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে-ছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর

সে আনন্দভাব নাই। মিছামিছি হাসি খেলায় আর সে ছেলে-মানুষি করে না! কারণে, অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ভূতে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্য কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয়, অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না, বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্প-বুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষে, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে 'আহা বেচারি' এইরূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তুলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্র-বৃষ্টির মধুর অভিনয়—মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া এখন আনন্দই দেয়। কখনও অত্যধিক যত্নসোহাগে, কখনও বিরক্তি-তাচ্ছিল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারীহৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন

লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্তকণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী যে?"

স্ত্রীর প্রশ্নে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল—"ওঃ কি গরমই পড়েছে?"

হাতের তালপাতার পাখাখানি একটু জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল,—"বাবা ত কতবারই আমাদের যাবার জন্যে লিখলেন তা তুমি যাবে না ত? শিমলেয় এখন ত সময় ভালই!"

স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে কেমন দ্রুতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; স্ত্রীর কথার উত্তর স্বরূপ কহিল—"চেষ্টা করব পূজার সময় যেতে! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত কখনই মিললো না! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না! নৈলে ক্ষতি কি ছিল আর!"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল—"জল খাবে চল। কাপড় বদলাবে না?"

আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তরে

কহিল—"না —খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হবে।"

অণিমা কহিল—"খাবে না কেন? কোথাও খেয়েছে বুঝি?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল—"না, খাইনি কোথাও।" স্বামীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া অণিমা বলিল—"তবে খাবে না কেন?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি?"

স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল—"কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্‌তে দুর্ব্বল-মস্তিষ্কে বলাধানের জন্য এটা যে কত উপকারক - তা যদি একটুও বুঝ্‌তে; তা হ'লে এমন নেই-আঁকড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।"

অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল—"থাক্—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।"

কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল—"বাঃ, তোমার নূতন চুড়ি দিয়ে গেছে যে দেখ্‌চি!—খাসা মানিয়েচে ত?"

"কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে, তখন আর খাসা মনে হবে না। ব'লেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে।—" অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল—"তোমায় খুসী কর্‌তে এ কি এমন বেশী দামী অণি!"

অণিমা কহিল—"আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি? সত্যি বল্‌চ চাও?, তবে ও ছাইভস্মগুলো খাও কেন?"

আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া, ঘড়িটি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া কহিল—"বলেচি ত, কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজগোজ্ করে বসে আছ ? কোথাও যাবে-টাবে না কি ? না, আস্‌বে কেউ ?"

অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্ত-ভাবে কহিল—"আমার মনে হচ্চে আজ যেন আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ঠিক্ করা ছিল ?"

আদিত্য বলিল,—"ওঃ, হোঃ, তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে !—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেন যাচ্চে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হবে আমার। তোমার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ে পোড়ো। কখন্ ফির্‌ব তার কিছুই ঠিক নেই ত।"

অণিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির সুরে কহিল—"বাঃ, সে হবে না। আজ আমি সারাদিন ধ'রে খাবার-টাবার সব তৈরি কল্লুম, তুমি খাবে না ? সে হবে না।"

"মাপ্ কর্‌তে হচ্চে, আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন ! রমেনের বোন্ নিজে হাতে আজ রান্না ক'রে খাওয়াবেন, খেয়ে গেলে ভারী রাগ ক'র্‌বেন তিনি, আমি ভালবাসি ব'লে নিজহাতে রাঁধবেন। জান ত কি রকম অভিমানী মানুষ।" অণিমার মনে হইল, বলে যে সেও অভিমান্ করিতে জানে। কিন্তু বলিল না। আদিত্য কহিল—

"শনিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্ করা গেছে—গদাধরকে বোলো,

আমার গরমের স্যুটটুটগুলো যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফিরতে মাস দুই দেরী হ'তে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল।"

সারাদিনের পরিশ্রম-যত্নে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণাম-কল্পনায় অণিমার মনে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল—"কোথায় যাব তাহ'লে আমরা?"

"আ-ম-রা!" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রী'র দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ'চ্ছে না।"

"একলা থাকতে পারবে?" বলিয়া অণিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল।

আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল—"তা চ'লে যাবে এক রকম। কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখতে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে ঘাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।"

অণিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"তুমিই কিন্তু ব'লে থাকো যে, স্ত্রী চিন্তা-রও সাথী।"

অপাঙ্গে টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানির দিকে চাহিয়া

আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমায় করতেই হবে সেখানে। বিরহসম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা ক'রে আন্‌বো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—"তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল—"তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে'নিজেকে আমি ভাগ্যবান্ বলেই মনে করি।"

অণিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল—"লেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!"

বাক্যপুরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল "বাঃ একেবারে অনিবেসান্ত! এই ত! কতকগুলো নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী হয় নি, এটা সতিকার; তাই পুঁথির লেখার সঙ্গে অক্ষর মিলিয়ে সংসার-ধর্ম্ম করা চলে না। নভেলের মানুষ আর সত্যি-মানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।"

অণিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"ভালবাসাও কি তাই? এও কি শুধু বইয়ের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে পনের মিনিট বাকী। ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া গম্ভীরমুখে গোঁফে তা দিতে দিতে কহিলেন—"আজগুবি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধেও তোমায় আগেও অনেক কথা আমি ব'লেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তি-বিকার কল্পনার ক্ষণিক মোহ—স্নায়ুর উত্তেজনা। এর

দৌলতে—অর্থাৎ এর বর্ণনা ক'রে হাজার হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্ধুকে বা গহনা কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যাঁরা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল হন, তাঁদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি-বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি, মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান্ ডাকলেও তা বেশীদিন টিঁক থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল—"সাদা কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়, যেমন রেশ্‌মী কাপড়, বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে যেমন তার রং চটে যায়, ভালবাসা ব্যাধিরও রং তেমনি পুরোণো হ'লেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হ'লে এর সুচিকিৎসাও জানেন। আচ্ছা এই ছ'টা বাজলো, আমি এখন তাহ'লে আসি।" অভ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নতমুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় কহিল—"কথাগুলো যা বল্‌লাম, নোট ক'রে রেখ' ত! দরকারে লাগ্‌তে পারে কখন না কখনো।"

এ রকম ফরমাইস্ অণিমাকে আরও অনেকবার খাটিতে হইয়াছে, আজ কিছু নূতন নয়। তবু আজ তাহার দুই চোখ

ছাপাইয়া জলের ঝারা সহসা ঝরণার মত ঝরিতে চাহিতেছিল। প্রাণপণে নিজের মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল রুদ্ধ রাখিয়া স্বামীর গমনশীল মূর্ত্তির পানে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, সে জানিত, সে মূর্ত্তি আর থামিবে না—ফিরিয়াও চাহিবে না।

আদিত্যনাথ মানুষটি আসলে কঠোরচিত্ত নহে। কেবল লেখক হইবার উচ্চাশায় আদর্শ পাইবার অদম্য লোভে নিজের স্ত্রীকে সর্ব্বদা গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলে ধীরে ধীরে তাহার স্বভাবে যে পরিবর্ত্তন আসিতেছিল, সে তাহা অনুভবও করিতে পারে নাই। লেখায় স্ত্রীজাতির প্রতি যে সুকোমল সহানুভূতি প্রকাশে সে জন-প্রিয়, সমাজে হৃদয়বান্ আখ্যায় আখ্যায়িত, সেই সহানুভূতির, অভাবক্ষোভেই তাহার তরুণী পত্নীর চোখের জল দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছিল। জগতে মানুষের কথা ও কার্য্যে এতই বৈষম্য। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মায়াবাদী বৈদান্তিকই তাহার নবোঢ়া পত্নীর কর্ণে ভালবাসার যে মোহিনী মন্ত্র ঢালিয়াছিল, সে নিজে তাহা বিস্মৃত হইলেও তাহার মন্ত্রমুগ্ধা স্ত্রী ভুলিতে পারে নাই। দু'বছর আগে ভালবাসার কথা কহিয়াই তাহাদের দিবারাত্রির ব্যবধান থাকিত না। আদিত্য সত্য কথাই বলিয়াছিল। ভালবাসার কথা সে এত বেশী বলিয়াছে যে, সারাজীবনে সে কথার আর উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে।

অণিমাও দুর্ব্বল-চিত্তা নয়—তবু সে নারী! স্বামীর স্নেহহীন,

প্রেমহীন, উদাসীন ভাব প্রথম যখন সে অনুভব করিতে সুরু করিল—কি গভীর বেদনায়, কি কঠোর মর্ম্মদাহী সন্দেহেই না তাহার কোমল হৃদয়খানি পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখন সে কথা মনে করিতেও লজ্জায় সে যেন মরিয়া যায়। ক্রমে সে বুঝিল, তাহার সন্দেহ অমূলক হইলেও, স্বামী পরস্ত্রীতে অনুরক্ত না হইলেও স্বামীর হৃদয়ে সত্যই তাহার আর স্থান নাই। সে তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী জীবন-সঙ্গিনী নহে, সে তাঁহার উপন্যাসের আদর্শ মাত্র। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ, আদিত্য এখন সুরাপান করিতে শিখিয়াছে। অণিমা তাঁহাকে অনুনয়ে বাধ্য করিতে পারে নাই। জোর করিয়া বারণ করিলেও তিনি শুনেন না। তাই সে লুকাইয়া কাঁদে। দুর্ভাগিনী সে, না পারিল স্বামীর প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতে, না পারিল তাঁহাকে ধ্বংশের মুখ হইতে ফিরাইতে। বৃথায় সে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যশের মুকুট পরিয়া আদিত্য এখন সাহিত্যগগনে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য; দিগ্বলয়ের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছে, ক্ষুদ্রা নারী কেমন করিয়া হাত বাড়াইয়া আর তাহার নাগাল পাইবে! অণিমার মনে হইল, তাহার রেশমী শাড়ীর রং শুধু মলিন নয়, একেবারে নিঃশেষে সাদা হইয়াই গিয়াছে।

২

জানালার ছিটের পর্দ্দার সবুজ রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল—"মা, ঘরে

আলো জ্বেলে দিই, সন্ধ্যে লেগেছে।" অণিমা তেমনি উদাস-নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে ভারী জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে অণিমা ঘোর বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট চীৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড়?"

আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া জাঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাথা সখী—ই—ই—', আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী—উড়ো—পা-খী-ই-ই"—সুর ধরিতে দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া বক্রকটাক্ষে আগন্তুকের পানে বারেক চাহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলে, অণিমা হাসিয়া কহিল—"গান থামান মুখুয্যে মশাই! আপনার মনের খবর জানতে ত আমার বাকী কিছু নেই। তারপর ইন্দোর ছেড়ে হঠাৎ যে বড় বাঙ্গলা-দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর-মুখে কহিলেন—"হঠাৎ আর কই বল? নিরু পানু কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এমনি ভার হ'য়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ করবেন না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বারুইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে তাইতে

আসা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দুটোকে বিদেয় কর্বার কোন পন্থা বার কর্তে পারা যায় যদি। তারপর তোমাদের খবর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?"

"যান—কাঁদতে গেলাম কি দুঃখে?" বলিয়া অণিমা উঠিয়া পর্দ্দা সরাইয়া জানলাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথ মুক্ত করিয়া দিল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন—"বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি, কিন্তু বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো করেই সৃষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো রে?"

অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"ছিল নাকি মুখুয্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্ছি।"

মুখুয্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন—"তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম। সত্যি কথা বল্তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!"

"—কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে-টাঙ্গান একখানি অত্যন্ত সাধারণ চেহারার বড় এন্লার্জকরা ছবির পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন—"এই বুঝি তোমার সাহেব?"

অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ-সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবি দেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন—"রাস্কেলটা না বই লেখে? তোমার দিদি ত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন। লোকটা লেখে ভাল তাহলে নাঃ?"

সমালোচক মাসিক-পত্রখানির পানে চাহিয়া অণিমা উদাসীন-ভাবে মৃদুস্বরে কহিল "প'ড়ে দেখুন না, লোকে কি বলে?"

ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান-টুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন—"লোকে যা বলে, তা লোকের মুখেই ত শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।"

"আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল—"পড়ুন্ না।"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যালিকার বিষণ্ণ মুখের পানে বক্র-কটাক্ষে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"বাঃ, খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টোঁয়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁক্‌বার এ অসাধারণ শক্তি ও-যে কোথায় পেলে, তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট-বেলায় ছোট্ট অণিটি, তা তার মুখুয্যে মশাই ইন্দোরে বসেও টের পেয়েছে! সত্যি অণি—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় খুসী হলুম। এই

চার বচ্ছরে আশ্চর্য্য বদ্‌লে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কিসে বলত?—স্বামীর প্রেমেই নয় কি? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্—কারণ তুমি তার স্ত্রী!"

"তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন—"তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি—খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি আমি।"

"মিছে হার্‌বেন,—না মুখুয্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে যায় না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ এইবার সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণ-স্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখনও আস্‌ত তা হ'লে ত? কথাটা দ্ব্যর্থমূলক হোল কি না?"

অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—"চা'র বছর বিয়ে হ'ল—বুড় হ'য়ে গেলুম—আবার ও-সব কি? চা' খাবেন? ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর-মুখে কহিলেন—"তাই ত' অণি, আমারই যে ভুল! চার-বচ্ছর তোমাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে! তোমরা ত' এখন তা'হলে বুড়-বুড়ী! আহা, তোমার দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধি উদয় হবে গা! তাঁর বিশ্বাস, মুক্তোর চুড়ী আর হীরের ব্রেস্‌লেটে, তাঁকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙা শাঁখা আর কস্তাপেড়ে শাড়ীতে কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। আহা, তুমি যদি দয়া করে তাঁর বানপ্রস্থের কাল সমীপাগত, তাঁকে এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে

পার—তাহ'লে অনায়াসে ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তার আয়রণ-চেষ্টের প্রসাদেই অনেকখানি কন্যাদায়ে উদ্ধারের উপায় হয়েযায়। আহা, আদিত্য কি ভাগ্যবান্ পুরুষ! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধ করি এখন বাড়ী ঢুকতে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুনতে হয় না।"

অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ রহস্য রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন—"না --না—বোস। এইবার কাজের কথা বলি! আমি যে তোমায় নিতে এলুম, তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি—আর পানু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে পথ চেয়ে রয়েচে! ব'লে এসে'ছলুম, আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোলো না দেখচি, তা হ'লে কবে হবে? তোমায় বেয়ারা বল্লে—সাহেবের ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর-বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে, ছুটিটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাকলে—" বলিয়া মাটীতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তটী উঠাইয়া লইতে মুখ নীচু করিয়া অণিমা কহিল—"আজই আমায় নিয়ে চলুন না মুখুয্যে ম'শাই—কত দিন দিদিকে দেখিনি, বলুন ত?"

"সত্যি অণি, অ-নে-ক দিন!—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে রে—

কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে লইয়া পলায়ন ঠিক আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো! সাহেব বাড়ী থাকেন কোন্ সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক কটায় এলে বল ত?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আজই কেন নিয়ে চলুন না! কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না—দেখবেন তখন। গেলেই বা কার ক্ষতি?"

ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল—"সর্ব্বনাশ! অয়ি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মহাশয়কে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও নাকি? না—না—লক্ষ্মি, আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কারু নেই কেন শুনি? গৃহিণীহীন গৃহ, সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!"

তাচ্ছিল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল—"তিনি ত' যাচ্ছেন শৈল্যবাসে—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।"

ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"ওঃ, তাই বল, অভিমান-পর্ব্ব।—রাগ হয়েছে—ক'দিন থাকবে সেখানে?"

"আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখতে, কল্পনাকে প্রাণ দিতে, মনের শক্তি সঞ্চয় করতে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হ'চ্ছে প্রধান ওষুধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত থাকা—সে

সময় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' অনুমানও ক'র্‌তে পার্‌বেন না।" ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিতমুখে কহিলেন—"না ভদ্রে! তা আমি পাল্লেম না,—তা ঐ সব পাগ্‌লামী কর্‌বার সময় তোমার ব্যবস্থাটা কি রকম হবে? তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না ক'রে বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আরও!—"

"দয়া করুন মুখুয্যে ম'শাই! আপনিও শত্রুতা করবেন না—তা হ'লে আমি ম'রে যাব" বলিয়া ফিরিয়া বসায়, আধ-অন্ধকারে অণিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আদ্র ও আর্ত্তভাব ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেলে প্রথমে অণিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজেহাতে সব তৈরী করেছি। কেবল কলায়ের ডালের কচুরি ক'খানা ভাজ্‌তে বাকী। আপনি বসে থাক্‌বেন, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক করাই আছে, দেরী একটুও হবে না, দেখ্‌বেন।"

৩

পাশের ঘরে জলযোগের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ছাঁটা রেশমের কোমল আসনের উপর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কহিলেন—"এ-সব কি কাণ্ড বল দেখি!—এ যে বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার

দেখ্‌চি? তোমার বেয়ারার কাছে শুনলুম, বাড়ীতে কেবল মেম-সাহেব ও সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকেন না। সাহেব ত' আবার নিমন্ত্রিত!—তবে স্বহস্তে এ রাজভোগের বন্দোবস্ত ক'রেছ কা'র জন্যে শুনি? মুখুয্যে-ম'শায়ের তার কি তাড়িত-বার্ত্তায় মনের মধ্যেও এসে পৌঁছেছিল না কি?"

অণিমা গ্লাসের জল বদ্‌লাইয়া বাতির আলো আর একটু কাছে আগাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল—"বসুন আপনি, সারাদিনের পরিশ্রম আমার সার্থক্ হোক্।" এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া তোলা-উনুনে ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিয়া নতমুখে আগুনের তেজ বাড়াইবার জন্য পাখার বাতাস দিতে সুরু করিল। তাহার বাষ্পজড়িত কণ্ঠস্বর ও চোখের পাতায় জলের উচ্ছ্বাস ব্রজেন্দ্রনাথ দৃষ্টি এড়াইল না।

কিছুমাত্র ক্ষুধা-বোধ না হইলেও খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া, রন্ধনকারিণীর শুভ্র গণ্ডে গোলাপ ফুটাইয়া অত্যন্ত পেটুকের মত ব্রজেন্দ্রনাথ আহার শেষ করিলে, অণিমা পান আনিয়া দিল। পানের খিলি-দুইটী মুখে পুরিয়া একখানা হাত অণিমার কাঁধের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন—"অণি, আমার কথার সত্যি জবাব দেবে ভাই, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?"

"কেন দেব না মুখুয্যে ম'শাই?" বলিয়া ব্রজেন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাই অণিমা একদিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন—"তবে বল দেখি, তুমি সত্য সত্যই সুখী কি না ?"

অণিমা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল—"আমায় দেখে তা কি মনে হচ্চে না, মুখুয্যে মশাই ?"

পাতলা চুলে ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিয়া চিন্তিতমুখে ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন—"হওয়া উচিত ছিল বৈকি ? খাসা গহনা কাপড়,—দিব্যি বাড়ী-ঘর !—আহারের বন্দোবস্ত ত' রাজভোগ ! তার উপর এমন স্বামী ! কিন্তু তবু যেন তোমার চোক্ বল্‌ছে—'ঝর্‌লুম' 'ঝর্‌লুম' !—আচ্ছা, যদি সুখী নও—তবে কেন নও—আমায় সব কথা খুলে বল দেখি ! চার বছর আগে এই মুখুয্যে-ম'শায়কে যেমন ক'রে তোমার রাগ, দুঃখ, ঝগড়া অভিমানের কথা শোনাতে—নালিশ—শালিশী মান্‌তে—তেমনি ক'রে চার বছর আগেকার সেই ছোট্ট অণিটি হ'য়ে তোমার মনের কথা একবার খুলে বল দেখি। তুমি যে একজন বাড়ীর গিন্নী, বুড়-ধাড়ী, সে কথা একেবারে ভুলে যাও। সরলভাবে সত্যি কথাটা বল ত লক্ষ্মী,—কোন কথা লুকিয়ো না ;—লজ্জা না, কিছু না—বল দেখি সত্যি সত্যিই তুমি সুখী কি না ?

অণিমার মনোদ্বেগে কম্পিত হাতখানি হাতের মধ্যে রাখিয়া স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন—"বল দেখি, বল।"

এই স্নেহময় আত্মীয়ের সুগভীর স্নেহের স্পর্শে অণিমার দুঃখের

জমাট-বাঁধা মেঘগুলি সহসা অশ্রুর আকারে জল হইয়া ঝরিয়া পড়িল। মনের ব্যথা সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কাঁদিয়া কহিল—"আমায় নিয়ে চলুন, মুখুয্যে-মশাই!—এখান থেকে আমায় নিয়ে চলুন! আমি এমন ক'রে আর থাকতে পাচ্ছি না।'

সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন—"নিয়ে যেতেই ত' এসেছি তোমায়। কিন্তু আমার কথার জবাব কৈ? বল্লে না ত?—তুমি সুখী কি না?"

নীরবে মাথাটী হেলাইয়া অণিমা জানাইল, সে সুখী। ব্রজেন্দ্র কহিলেন—"তবে কাঁদলে কেন?—ওঃ বাপের বাড়ী যেতে দেয় না, নাঃ? তাই ত! তা হ'লে কি ওখানেই যেতে দেবে?"

অণিমা এবার বাধা দিয়া সবেগে বলিল—"সে বুঝি আমার জন্যে?—সে তাঁর লেখার জন্যে। আমার জন্যে তাঁর ত বড় বয়েই যাবে।"

ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"লেখার জন্যে কি রকম? তুমি কি তাঁর সেক্রেটারী না কি?"

"না মুখুয্যে-মশাই, এমন করে শুধু ভাব-সংগ্রহের যন্ত্র হয়ে, তাঁর উপন্যাসের মডেল হয়ে, আমি আর বেঁচে থাকতে পাচ্ছি না! আমি তাঁর স্ত্রী নই, কেও নই। আমায় তাঁর কোন দরকার নেই। কেন জানেন? গার্হস্থ্য-জীবন লেখকের কল্পনায় ছাতা ধরিয়ে

দেয় বলে।" ব্রজেন্দ্রনাথ শুনিয়া প্রথমতঃ কিছুক্ষণ হাঃ হাঃ, করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া, হাসি থামিলে কহিলেন—"তাই ত বলি, এমন জ্যান্ত মডেল ওটা পায় কোত্থেকে? চমৎকার মতলব বার করেচে ত? হিংসে হচ্চে যে দেখে শুনে, তোমার দিদিটি ঠিক উপন্যাসের নায়িকোচিত নন্, না চেহারায় না সহ্য ধৈর্য্য ইত্যাদি ইত্যাদিতে।" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া একটা বড় রকম 'হুঁ' দিয়া পুনরায় কহিলেন—"কোথায় যাবে সে বেড়াতে?"

অণিমা কহিল—"তা আমি জানি বুঝি?—বোধ হয়, কারশিয়ং।" তদুত্তরে ব্রজেন্দ্র কহিলেন—"কিছু বলে নি তোমায়? —জিজ্ঞাসাও কর নি বুঝি?"

"না, করি নি,—করবার দরকার আমার?" বলিয়া অণিমা অভিমানভরে একদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ঠোঁট-দুটী একটু একটু কাঁপিতেছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ এবার একটুখানি গম্ভীরভাবে কহিলেন—"দরকার আছে বৈ কি? আচ্ছা, সংসারে স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কিছু নেই ত? তবে সব চেয়ে যে আপনার, তার কোন কথা গোপন থাকা উচিত কি? সব কথা কি পরস্পরের কাছে বলা ভাল নয়? ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

অণিমা মুখ-ভার করিয়া বলিল—"না, ঝগড়া আমাদের কখনো হয় না।—"

"হয় না!" বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ অণিমার বিষণ্ণ নতমুখের পানে

কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন—"এটা ত খুব ভাল লক্ষণ নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগ্‌ড়া হয় না?—অ্যাঁ! আশ্চর্য্য ক'রে দিলে যে আমায়! বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে!—তুমি ত কোঁদলের একটা জাহাজ। আচ্ছা, আদিত্য যত্ন করে ত তোমায়?"

অণিমা চোখ নীচু রাখিয়াই উত্তর দিল—"করেন, যখন তাঁর 'কাপির' দরকার হয়। নৈলে মনেও পড়ে না—বাড়ীতে কেউ আছে ব'লে। তাঁর সময় এত কম দামী নয় যে, বাজে নষ্ট কর্‌বেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিত-মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"আমায় বিশ্বাস কর অণি, কাল যেমন ক'রে হ'ক্ তোমায় নিয়ে যাব; কিন্তু তার আগে তুমি ব'লে ক'য়ে ঠিক্ হ'য়ে থেক। অ্যাঁ স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগ্‌ড়া হয় না?—অবাক্ করে দিলে যে আমায়! তোমার দিদিকে গিয়ে এটা ত' বল্‌তেই হবে তাহ'লে; এটা খুব ভাল বন্দোবস্ত—অ্যাঁ—?"

৪

পরদিন বেলা দুইটা না বাজিতেই একখানি সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ীর মাথায় কিছু ফলমূল-জিনিষপত্র চাপাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিবার সময় স্ত্রী বলিয়া দিয়াছিলেন—"অণু নিরুকে দেখিতে আসিবে, কিছু ভাল ফল মিষ্টি

কিনিয়া আনিও।” নিজেরও কয়েকটি জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল ;—এক জোড়া জুতার ফরমাইস্ দিতে হইল। এই সব কাজে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই খবর পাইলেন—সাহেব আহারান্তে বাহির হইয়া গিয়াছেন ; ফিরিবার সময়ের কথা চাকর-বাকরেরা জানে না। বিরক্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করিলেন—“আজও তবে হয় ত যাওয়া হইল না। অথবা না যাইতে দিবারই ইহা ফন্দি! আচ্ছা অভদ্র ত!”

উপরে উঠিতে আজ আর দরয়ান্ বেহারা কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কল্য তাহারা শুনিয়াছে, ইনি কর্ত্রীর আত্মীয়, আর কেহ কেহ দেখিয়াওছে যে, কর্ত্রী নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া কত যত্নে ইঁহাকে খাওয়াইয়াছেন, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামও করিয়াছেন। তাই বিনা দ্বিধায় তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। সিঁড়ির মাথায় অণিমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। পায়ের শব্দ পাইয়াই বোধ হয়, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, অণিমা একখানি মেঘলা-রং ঢাকাই সাড়ী ও সেই রংয়েরই একটী ব্লাউস্ পরিয়াছে ; দুই-চারিখানি অলঙ্কারও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটুখানি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন—“আদিত্যবাবু বেরিয়ে গেছেন, দেখা হ'লো না! বড় মুস্কিলেই পড়া গেল ত! তোমার যাবার কি হবে তা' হলে? অনুমতি পেয়েছ না কি? যাবে সত্যি সত্যিই?”

অণিমা আঁচলের চাবি খুলিয়া রাখিয়া সোণার সেফ্টীপিন

আঁটিতে আঁটিতে মুখ নীচু করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—"ভয় পাচ্ছেন বুঝি, মুখুয্যে-মশাই!—ভাবছেন বোঝাটা ঘাড়ে পড়েই গেল তা'হলে?"

ব্রজেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ভার করিয়া কহিলেন—"অয়ি প্রিয়ম্বদে! যদি অভয় দাও ত' বলি, এ বুড় ঘাড়ে বোঝা বইতে চাহিলেই কি বোঝা এ ঘাড়ে থাকতে রাজী হবে? না, তামাসা থাক্। তুমি ত' তৈরী দেখ্‌ছি। রাস্কেলটা বুঝি আধ-ঘণ্টা দেরী কর্‌তেও পাল্লে না? তা হ'লে যাবার কি-রকম হবে বল দেখি?"

"কেন, সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ব—আমার সব গুছন-গাছানই আছে। চলুন না।" বলিয়া অণিমা অগ্রসর হইল দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ আদিত্যনাথের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়ার জন্য নিজ মনঃক্ষোভের সংবাদ পুনরায় মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতে করিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

৫

ঘর অন্ধকার। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আদিত্য ডাকিল, "অণি!" অন্যদিন যেখানেই থাকুক না, স্বামীর সাড়া পাইয়া এই অণিমা শতকার্য্য ত্যাগ করিয়া কাছে আসে। আজ ত তাব তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আদিত্য পুনরায় ডাকিল—বেহারা ঘরে আলো দিয়া গেল। আদেশ-প্রার্থনায় ঝি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলে

আদিত্য বলিল, "এরা গেল কোথায় ?" ঝি বলিল, "মা সেই লম্বা হেন সুন্দর বাবুটীর সঙ্গে দুপুর-বেলাই চলে গেছে !"

"চলে গেছেন ?" আদিত্য বিস্মিতভাবে কহিল—"কার সঙ্গে !—কোথায় গেছেন।"

ঝি বুদ্ধি খাটাইয়া বাবুকে নিশ্চিন্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল—"সেই যে বাবুটী আসে,—হেসে হেসে কথা কয়,— মস্ত জোয়ান মানুষ, তেনার বাড়ীতেই গেছে, বোধ করি !"

আদিত্য বিরক্তি-ভরে কহিল— "সঙ্গে কে গেল ? কখন ফিরবে ব'লে গেছে ?"

চাঁপা, বাবুর ভ্রূকুটীপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়াছিল। সে ভয়ে ভয়ে কহিল—"তা ত' কিছু বলে নি বাবু ! আমি সুধুলুম আমায় যেতে হবে কিনা ?—মা বল্লে, 'না, চাঁপা তুই থাক্, বাড়ী ঘর রইল। ঐ টেবুলের উপর কি চিঠি আর চাবি রেখে গেছে আপনার তরে।"

কুঞ্চিত-ললাটে ঊর্দ্ধমুখে আদিত্য ভাবিতে লাগিল—"কে সে দীর্ঘ-প্রস্থ সুন্দর পুরুষ !—তাঁহাকে না জানাইয়াই তাঁহার অণি স্বেচ্ছায় যাঁহার সহিত স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে পারে ? তাঁহার বা অণিমার কোন আত্মীয় হইবেন কি ? কে সে আত্মীয়টী ? দাসী বলিয়াছে, যে বাবুটী আসেন। তবে নূতন কেহ নহেন। কিন্তু কে আসেন ? কোন পরিচিত এমন পরমাত্মীয়ের সংবাদ ত' কই স্মরণ হয় না। কিন্তু অণিমা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে, না ? ঐই চিঠিতে সে সব কথা নিশ্চয়ই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে;

না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবার কথাও লিখিয়াছে। আদিত্য ভাবিয়া দেখিল, ক্ষমা ত করিতেই হইবে, কিন্তু সহজে নয়। এ কি অন্যায় কথা! ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইলেও তখনি পাঠ করিল না। লেখাটি ভাঁজ না করিয়া প্রসারিতভাবে টেবিলের উপর এমন করিয়া রাখিয়া দিল, যাহা সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। পাছে বাতাসে উড়িয়া যায়, তাই একটি পাথরের গোলক দিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ সে অণিমার আচরণের বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল,—অণিমার এতখানি স্বেচ্ছাচারিতা অনুচিত; এজন্য সহজে তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। সে যেমন না বলিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিয়া গিয়াছে, আদিত্য তেমনি কোন সংবাদ না লইয়া অবহেলা দেখাইয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দিবে। কিন্তু মিনিট্ দুই পরেই আদিত্যনাথকে সঙ্কল্প বদল করিতে হইল। সে ভাবিয়া দেখিল,—অণিমাকে ক্ষমা করাই ভাল। ছেলেমানুষ না বুঝিয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার কি আর মার্জ্জনা নাই! বিশেষতঃ, সে যেরূপ অভিমানী, আদিত্যের কৃত্রিম অনাদর-প্রকাশেও হয় ত কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা ধরাইয়া জ্বর করিয়া বসিবে। কাজ নাই, মাপ করাই ভাল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার অন্যায়ের জন্য একটু কড়াভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অণিমাকে

ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়া গেলে, আদিত্যনাথ অণিমার চিঠিখানি আলোর কাছে খুলিয়া মেলিয়া ধরিল। চিঠির সঙ্গে আর একখানি কাগজ ছিল, তাহাতে অণিমার নিজহাতে বয় লাইন লেখা—

"ভালবাসা স্নায়ুর বিকার, মনোবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণ ; সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় সহজেই ইহা আরোগ্য-লাভ করে। ভালবাসা গুণবিশেষ। সময়-রৌদ্র ভালবাসারূপ রেশমী-শাড়ীর বর্ণ বিবর্ণ করিয়া দেয়।" এই মন্তব্যটুকুর সহিত আর একখানি কাগজে কোন সম্বোধন না দিয়া পত্রের মত লাইনকয়েক লেখা। তাহা এই—

"আমি চলিলাম। আশা করি, বাড়ীতে ও সঙ্গে স্ত্রী না থাকায় তুমিও আজ সম্পূর্ণরূপে রাহু-মুক্ত। প্রার্থনা, তোমার পশ্চিম ভ্রমণ নিরুদ্বেগ ও সুখকর হউক। মস্তিষ্ক শীতল রাখা ও মনের শান্তিবিধানের কোন অন্তরায় আর বর্ত্তমান রহিল না। ভালবাসা-সম্বন্ধে তোমার প্রাকৃতিক জ্ঞান উন্নত। তোমার কাছে এ সকল উচ্চ বিষয় আলোচনার আমি অযোগ্য, তাই যাঁহার নিকট যথার্থ ভালবাসা পাইয়াছি ও যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহারই কাছে চলিলাম। নিতান্ত আবশ্যকমত দুই-একখানি কাপড়-গহনা ছাড়া সমস্তই যথাস্থানে রহিল। তোমার চেঞ্জে যাইবার ট্রাঙ্কও গুছাইয়া রাখিলাম। প্রণাম গ্রহণ করিবে। বিশ্বাস করো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভালবাসতুম—উপন্যাসের নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।

—অণিমা—"

কোটেসনের মধ্যে লেখা আছে যে দুর্ব্বলচিত্তা নারী, তাই ভালবাসারূপ স্নায়ুর বিকার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। একা থাকিবার মত সৎসাহসেরও তাহার অভাব ; তাই এই পন্থাই তাহাকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইল।

চিঠি পড়িয়া আদিত্যকে অবলম্বনের জন্য জোর করিয়া টেবিলের উপর হাত রাখিতে হইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল। ললাটতলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। দেহমন এমনি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল যে, মনে হইল, এখনি বুঝি সে সংজ্ঞা হারাইবে। মনে হইল, ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র, সমস্তই যেন ঘুরিতেছে। আর সেই ঘূর্ণ্যমান্ গৃহের মধ্যে অণিমার হাতের লেখা অক্ষরগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি-গ্রহণে অর্থহীন শব্দযোজনা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার চোখের উপর নর্ত্তন করিতেছিল। সে হাত দিয়া কপাল টিপিয়া নিজেকে স-সংজ্ঞ রাখিবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যে কখন রাত্রি আসিল এবং রাত্রিটাও যে কি-ভাবে কাটিয়া গেল, আদিত্য তাহার খবর দিতে পারে না। দাসী-চাকর আহারের কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। চিন্তা ডুবাইবার জন্য শরীর-মনের ক্লান্তিনাশক ঔষধ আসিল। বোতল খালি হইয়া গেল। তবু বিস্মৃতি আসিল না। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল, কেবল জিব শুখাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, রাত্রির মধ্যে একবারও সে বিছানা স্পর্শ করিল না। তবু কর্ত্তব্য নির্ণীত হইল না। করা যায় কি?

কোথায় সে পলাতকা? সাজান ঘরখানির চারিদিকে তাহারই সহস্র স্মৃতি ফুটিয়া রহিয়াছে। টেবিলে মাথা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াই তাহার প্রায় রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। আদিত্য ভাবিতেছিল, —অণিমা চলিয়া গিয়াছে! সে যাহাকে ভালবাসে, তাহার কাছে ভালবাসা পাইয়াছে,—তাহার সহিতই চলিয়া গিয়াছে! কে সে? কে তাহাকে ভালবাসে? তাহার স্ত্রীকে—তাহার অণিকে, তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে শুধু ভালবাসার অধিকারে টানিয়া লইতে পারে—কে সে এমন শক্তিমান্ পুরুষ? অণিমার পিতার টেলিগ্রাম সে পূর্ব্বদিন পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, —তাহাদের সিমলা যাইবার প্রস্তাবের উত্তরে "সিমলায় ভয়ানক নিমোনিয়া হইতেছে,—এখন তাহাদের না যাওয়াই ভাল।" তবে? তবে কাহার সহিত সে চলিয়া গেল? সুন্দর-হেন যুবা-পুরুষ, আদিত্য কাহাকেও মনে করিতে পারিল না। টেবিলের উপর রাশীকৃত হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, তাহার ভিতর কত নায়ক-নায়িকার দীর্ঘশ্বাস, কত ভালবাসার ইতিহাস সঞ্চিত! এগুলি আদিত্যনাথের নিজের রচনা! সেল্‌ফের উপর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধান উপন্যাসগুলিতেও ভালবাসার হা হতোঽস্মি ভরা। লেখক আদিত্যনাথ। আর ঐ যে "মৃগতৃষ্ণা" যাহার প্রশংসায় আদিত্যের পথে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে!—ইহাও যে সেই ভালবাসারই গান! কাগজের উপর কালীর আঁচড়, কবির কল্পনা, মোহের বিকার, সত্যই কি তাই? তবে এত ভালবাসার

গান সে গাহিয়াছিল কেমন করিয়া? আদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। এই সব ভালবাসার কথা অণিমা তাহার স্বামীর লেখাতেই পাঠ করিয়াছে, জীবনে ইহার কতটুকুই বা সে অনুভব করিতে পারিয়াছে, সুধা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়াও সে দুর্ভাগিনী তৃষিতই রহিয়া গেল। সে জানিল না, তাহার স্বামী সুধু ভাবুকই নহেন। নিজেরই ভাব তাহার মনে পড়িল, ঐ 'মৃগতৃষ্ণা'র প্রুফ দেখা ও রচনার জন্য প্রায় মাসখানেক হইল অণিমার সহিত একটা ভাল করিয়া কথাও সে কহে নাই। কত রাত্রি পর্য্যন্ত ঢাকা চাপা খাবারের পাশে বসিয়া অথবা কার্পেটের উপর মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইয়াই তাহার রাত কাটিয়াছে! আহারের বা শয়নের জন্য তাগিদ্ দিলে, অকারণে আদিত্য বিরক্ত হইয়াছে। মনে পড়িল, কালও যে নিজের রান্না খাওয়াইবার জন্য কত বিনয়ে অনুনয়ে সে সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। মনে মনে কখনও সে নিজেকে "পাষণ্ড" বলিতেছিল—কখনও অভিমানে অণিমাকে "পাপিষ্ঠা" বলিয়া গালি দিতেছিল। সে তাহাকে ভুলিতে চায়। জন্মের মত ভুলিতে চায়!—না সে তাহাকে হত্যা করিতে চায়! দুর্ভাগা নারী স্বামীর হৃদয়ভরা প্রেমের এই প্রতিদান দিয়া গেলি? টেবিলের উপর অণিমার হাতের লেখা চিঠিখানি পড়িয়াছিল। আদিত্য তাহা অনেকবার পড়িয়াছে,—চোখের জলে তাহার অনেক জায়গা ভিজিয়া অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তবু সেই বহুবার-পঠিত কাগজ দুইখানি তুলিয়া লইয়া সে আবার পাঠ

করিল—"বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভালবাসতুম—উপন্যাসের নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।" হায়! আদিত্য ত কখনও স্ত্রীর ভালবাসায় সন্দিহান হয় নাই। পূর্ণ বিশ্বাসেই যে সে ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছে;—সেই ভালবাসারই বলে বলীয়ান্ হইয়াই না সে জগৎকে ভালবাসার রাগিণী শুনাইতেছিল! অণিমা আজ দুই পা দিয়া তাহার সুরবাঁধা বেহালার তার মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে! আদিত্যের মনে হইল, এতদিন সে বৃথাই ভালবাসার গান গাহিয়া আসিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ, ক্রোধ ও ঈর্ষায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঘরের মেঝেয় রাশীকৃত কাগজপত্র ছড়াইয়া, সমস্ত জিনিষ ওলটপালট্ করিয়া সারাদিন সে ঘরের ভিতর পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল।

৬

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ডিটেক্‌টিভ বন্ধুর সহায়তায় এক সপ্তাহের পর আদিত্যনাথ অণিমার সন্ধান পাইয়াছে। বন্ধু লিখিয়াছেন,—

"বারুইপুরে একখানি বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া তাহার স্ত্রী সেই ভদ্রলোকটির সহিত বাস করিতেছেন। সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে এই মুহূর্ত্তে বাহিরে যাইতে হইল, নচেৎ তিনিই সীতা-উদ্ধার করিয়া আনিতেন। বাগানবাড়ীখানি নূতন ভাড়া লওয়া হইয়াছে;—মেরামতও নতুন, রং হওয়ায় চিনিয়া লইতে অসুবিধা

হইবে না। লম্বা যোয়ান প্রসন্নমুখ ভদ্রলোকটীকেও তিনি দেখিয়াছেন ;—হাঁ মানুষের মত চেহারা বটে !"

চিঠি পড়িয়া রাগে দুঃখে আদিত্যের মনের ভাব ভীষণ হইয়া উঠিল ;—এক সপ্তাহ সে সেখানে বাস করিতেছে ! কর্ত্তব্যচিন্তায় তাহাকে অধিক্ষণ কালক্ষেপ করিতে হইল না। তাহা একপ্রকার স্থির করাই ছিল। এই কয়দিন সারা রাত্রিদিন এই চিন্তাতেই তাহার কাটিয়াছে। আদিত্যনাথের ও অণিমার যে-কয়জন আত্মীয় ছিলেন, কৌশলে সকলের নিকট হইতেই সে সংবাদ আনাইয়াছে। অণিমা তাঁহাদের কাহারও বাটী যায় নাই। দাসী-চাকরের বর্ণনা হইতে যতটুকু সে জানিতে পারিয়াছে,—তাহা হইতেও সেই লম্বা যোয়ান সুন্দর পুরুষের মূর্ত্তি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। ডিটেক্‌টিভ বন্ধুর চিঠিতেও তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া প্রমাণ করায় নাই ! তবে—?

ডেস্ক খুলিয়া একটা ভারী জিনিষ ও মণিব্যাগটী আদিত্য তাহার ওভারকোটের পকেট ভরিয়া লইল। ঘরের জিনিষপত্র, টাকা-কড়ি, চাবী, যেখানে যাহা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা ঠিক তেমনই ছড়ান পড়িয়া রহিল ; গুছাইয়া রাখিল না ;—রাখিবার আর প্রয়োজনই বা কি ? দ্বারবান্ সঙ্গে যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে আদিত্য কহিল—"দরকার নাই।"

ষ্টেসনে দুই একজন পরিচিতের সহিত আদিত্যের সাক্ষাৎ হইল। তাহার অসম্ভব গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া কেহ কিছু

জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অনেকেই তাহার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছিল,—সে কিন্তু কাহারও পানে চাহিতেছিল না। টিকিট্ কিনিয়া সে গাড়ীর একপাশে বসিল, ষ্টেসনে একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া লইল; পড়িবার জন্য নয়, অন্যের দৃষ্টি হইতে নিজকে গোপন করিবার জন্য।

গাড়ীখানি মৃদুমন্দ গমনে চলিয়া কয়েকটী ষ্টেসনে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। আদিত্যের সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল না, সুতরাং কুলীর প্রয়োজন নাই। গাড়ী থাকিলে মন্দ হইত না কিন্তু। ছোট ষ্টেসন,—যা দুই-একখানি গাড়ী ছিল, তাহার কাছে স্ত্রীপুরুষের জনতা দেখিয়া আদিত্য গাড়ীর আশা ছাড়িয়া পদব্রজেই চলিতে সুরু করিল।

পথের দুইধারে সবুজ জমি। একদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় সবুজের গাঢ়ত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। একস্থানে নেবুগাছের জঙ্গল। ফুটন্ত ফুলের গন্ধ বাতাসে মিশিয়া দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। দূরে ধান্যে ক্ষেতের অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-আলোক-শিখা বাতাসে ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে। দুই একজন গ্রাম্যলোক পথ চলিতেছিল। আশে পাশে চারিদিকে কাব্যের উপাদান প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত। তবু কবিচিত্ত আজ আর সে শান্তসন্ধ্যার পল্লীচিত্রে মুগ্ধ হইল না। তাহার দুই জ্বালাময় চক্ষু যে অজ্ঞাত উদ্যানবাটীকার অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তাহারই কোন নিভৃত সজ্জিত

কক্ষে নরনারীর যুগলমূর্ত্তি-স্মরণ-কল্পনায় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য-বোধই তাহার মন হইতে লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

একজন চাষী সাম্‌নের ক্ষেত হইতে উঠিয়া পথ চলিতে সুরু করিলে, আদিত্যনাথ তাহার নিকট হইতেই নূতন মেরামত-হওয়া বাগানবাড়ীখানির সংবাদ জানিয়া লইল। লোকটা কিছু বেশী কথা বলিতে ভালবাসে। সে খুসী হইয়া আদিত্যের প্রয়োজনের অধিক সংবাদই জানাইল; কহিল—"এই যে সাহেব, আমি ত' ঐ দিকেই যাচ্চি। এই হপ্তা দুই হোল, সেখানে ভাড়া এসেছে। কর্ত্তা বড় ভাল-মানুষ, আর খুব আমুদে। এই পরশুদিন সকালে আমায় ডেকে বল্লে, 'ন'কড়ি, দু'জন নগ্‌দা লোক ঠিক করে দিতে পার? বাগানটা সাফ সুতরো করে দেবে। যে জঙ্গুলে-দেশ বাবু তোমাদের,—কোন্ দিন সাপে ছোবল দেয় বা!' তা আমি বল্লু, 'কর্ত্তা পড়ো-বাড়ী কি না, তাই এত জঙ্গল! তা নোকের ভাবনা কি? মনে কচ্ছ এতটুকু গাঁ,—এতে কি আর নোক পাওয়া যাবে? একবার হুকুম দিয়েই দেখ না—পাও কি না? এই ন'কড়ি দাসের অনুমতি পেলে এখুনি দুশো নোক হাজির হবে। কর্ত্তা হাস্‌তে নাগ্‌লো; বল্লে—'না ন'কড়ি আমি গরীব-মানুষ, দু'শো নোক দিয়ে কর্‌বো কি? তা'ও ত বেশী দিন এখানে থাক্‌বো না। যে ক'দিন আছি, একটু সাফ সুতরো করে নিয়ে থাকতে চাই। তুমি বাবু ঐ দুটো নোকই আমায় দিও।" নকড়ী দাসের বক্তৃতা শুনিবার মত মনের অবস্থা

আদিত্যনাথের ছিল না। সে নীরবেই পথ চলিতেছিল। শ্রোতার নিকট উৎসাহ না পাইয়া নকড়িরও সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসিতেছিল;—অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া দিয়া সে এইবার নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।

গ্রামের শেষ-প্রান্তে সন্ধ্যার অল্প অন্ধকারে ও বাগানের মধ্যে বাড়ীখানি বেশ দেখা যাইতেছিল। খোলা ফটকের সামনে কাঁকর-ফেলা রাস্তা। আশে পাশে বড় বড় গাছপালার মাথায় ইহারই মধ্যে জোনাকীর বাতী জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জানালার খোলা পাখীর মধ্য দিয়া কোন কোন ঘরের আলো বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং রন্ধন-গৃহের নীলাভ ধূম ধুসর সন্ধ্যার আকাশে মিশাইয়া যাইতেছিল। আদিত্যনাথ আলোক-অনুসরণে গৃহাভ্যন্তর দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিতরের দৃশ্য কিছুই দেখা গেল না। কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়-ভাবে সে যখন নিজের কর্ত্তব্য-চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল, তখন হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় অতিকষ্টে পতন-নিবারণ করিতে গিয়া তাহার চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল। তাহাকে প্রশ্নের অবসর না দিয়াই আগন্তুক ভারী-গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে কে?"

তাঁহার পূর্ণ দীর্ঘপ্রস্থ প্রকাণ্ড শরীরের পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই আদিত্যের মনে হইল, "এই—সে!" আদিত্য বিনাবাক্যে নিজের 'ওভার কোটে'র পকেটে হাত ভরিয়া দিল।

উত্তর না পাইয়া প্রশ্নকারী বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"কে ম'শাই আপনি? অন্ধকারে ভদ্রলোকের বাড়ীর দোরে কি খুঁজ্‌ছেন?" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি ফটক বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া আদিত্যনাথ অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া কহিল—

"এক মিনিট দেরী করুন। আপনিই কি কল্‌কাতা থেকে কোন ভদ্র-মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, আর এই বাড়ীতেই রেখেছেন?"

আগন্তুকের তীব্র দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া আদিত্যনাথের মুখ দেখিয়া লইতেছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ও রূঢ়স্বরে উত্তর হইল,—

"হাঁ, এনেছি—রেখেছি, তোমার তাতে কি?"

অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে "কিছু আছে বৈ কি?"

এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার তাঁহার 'ওভারকোটে'র পকেট হইতে ভারী জিনিষটা টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী দীর্ঘাকার বলবান্ পুরুষ তাঁহার পীচের লাঠিটি বামহস্তে রাখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে লেখকের হাতখানি বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ঘুরাইয়া ধরায়, রিভলভারের গুলিটা আওয়াজ করিয়া হাওয়ায় বাহির হইয়া গেল।

অধিক বলের সহিত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর-স্বরে তিনি বলিলেন,—"কে তুমি? তার স্বামী?"

হাত ছাড়াইবার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে

আদিত্যনাথ কহিল—"আর তোর যম ! চোর, ডাকাত, পাজী, বদ্‌মাস্‌, শয়তান, রা স্কল !"—

ঔপন্যাসিককে ভাষা-সংগ্রহের জন্য আর অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না ; তাঁহার হাতের বন্দুকটি কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলবান্ লোকটার পিচের লাঠিটি ততক্ষণে আদিত্যনাথের পৃষ্ঠে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ঘরের একটি দরজা খুলিয়া গেল। উজ্জ্বল কেরোসীনের আলোয় আদিত্য দেখিল—অণিমা ও আর একটি স্ত্রীলোক। ভয় পাইয়া তাঁহারা দুইজনেই চীৎকার করিতেছিলেন। সেই মুহূর্তেই আহত ও আঘাতকারী, দুইজনে দুইজনকে ছাড়িয়া দিলেন। আঘাতকারী ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের আত্মবিস্মৃতিতে অত্যন্ত লজ্জানুভব করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

আদিত্যনাথের ক্রোধের কারণ তখনও দূর হয় নাই। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমি ওকে খুন ক'র্‌বো ;—ওকে খুন ক'র্‌বো, তোকেও"—

"কিন্তু আমি যে সে-দু'টোর একটাতেও রাজী নই, ভাই ! অণি, তোমার দিদিকে বল,—তাঁর স্বামীর হ'য়ে—আদিত্যবাবুর কাছে উনি মাপ চান্। আমার ত' আর মুখ নেই"—বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ হাস্যোৎফুল্ল-নেত্রে অণিমার পানে চাহিয়া দেখিলেন। অন্ধকার না হইলে দেখা যাইত, ব্রজেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যে পরিমাণে অনুতাপের ব্যথা ধ্বনিত হইল, মুখভাবে তাহার কোন চিহ্নই প্রস্ফুট ছিল না।

আদিত্যনাথ সহসা—অঁ্যা—আপনি—ব্রজেন্দ্রবাবু!” বলিয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

ছোট ছেলেটীকে যেমন করিয়া কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া যায়, তেমনি করিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ অবলীলায় আদিত্যনাথকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অণিমা ঘরে আসিলে, তিনি কহিলেন,—“আমি ভাবছি, তুমি আমায় মনে মনে খুব গালাগালি দিচ্ছ। কিন্তু সত্যি বলছি,—আমি এতটা ভেবে দেখিনি!”—

একবাটী গরম দুধ ও একখানি চামচ হাতে করিয়া অণিমার দিদি নীলিমা ঘরে ঢুকিয়া রাগরক্তমুখে স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—“ছিঃ, ছিঃ, কি গোয়ার্ত্তুমি কল্লে—বল দেখি? বেচারার গায়ের ব্যথা মর্‌তে কতদিন যাবে এখন!” ব্রজেন্দ্রনাথ স্ত্রীর পানে ফিরিয়া স্বর নামাইয়া বলিলেন,—“এরেই বলে কাজীর বিচার! তোমার ভগ্নীপতি যে গুলি চালালেন, সেটা কিছু হোল না? দোষ হ'লো আমার—তা থেকে আত্মরক্ষা করাটা! উপন্যাসিকেব কলম থেকে সে গুলি বেরোয় নি, ম্যাডাম—সত্যিকার জ্যান্ত রিভল্‌ভার থেকে! কোন লেডিরই সাধ্য ছিল না, উপন্যাসের নিয়মে তার মধ্যে বুক পেতে গিয়ে দাঁড়ান।”

মূর্চ্ছাভঙ্গে আদিত্যনাথ বিস্মিত-চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই গৃহ এবং গৃহের আস্‌বাবপত্র সমস্তই তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব। সে কোথায় আসিয়াছে। অথবা ঘুমাইয়া স্বপ্ন

দেখিতেছে। স্বপ্ন কি মানুষ চোখ চাহিয়া দেখে। এই ত সে চোখ চাহিয়া আছে—তবে স্বপ্ন কেমন করিয়া হইবে। ক্রমে ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা সমস্তই তাহার স্মরণপথে উদিত হইল। তাহার খাটের পাশে মাটীতে বসিয়া অণিমা উদ্বেগ-ব্যাকুল-চোখে তাহার পানে চাহিয়াছিল। অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে আদিত্য কহিল—"এমন ক'রে চলে আসা—এটা কি তোমার ভাল হ'য়েছিল অণি?" অপরাধিনী মুখ নীচু করিয়া ধরাগলায় জবাব দিল—"না, একটুও না। আমি ভারী দুষ্টু, আমায় মাপ কর তুমি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ এতক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিলেও পীড়িতের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আদিত্যকে কথা কহিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া বিনয়নম্র নিঃস্বরে কহিলেন—"সবার আগে মাপ চাওয়া যে আমার দরকার। পার্‌বে কি তা করতে? শুধু অতিথিই ত নও তুমি, আমার বড় আদরের অণির বর। তবু নির্লজ্জের মত প্রার্থনা,—আজকের ঘটনার—সুধী তুমি,—নীর ফেলে শুধু ক্ষীরটুকুই নাও ভাই। অণি যে তোমায় জব্দ কর্‌বার জন্যে না ব'লেই আস্‌তে চেয়েছিল, সেটা তার মোটাবুদ্ধি মুখুয্যে-মশায়ের চোখে আদপেই ধরা, পড়ে নি। অণির দিদি ব্যাপার শুনে বল্লেন, দোষ যা হবার তা ত হ'য়েই গেছে, এখন ওঁকে খবর না দিয়ে একটু শিক্ষা দিয়ে দাও। গার্হস্থ্য-জীবন যখন ওঁর কল্পনার পাখায় ছাতা ধরিয়ে দিচ্চে, তখন দিনকতক খোলা-ডানায় উড়েই দেখুন। মনে কর্‌লেম মন্দ কি? তৃষ্ণা না এগোয়, তখন জলই না হয়

এগুবে। এবারকার পূজার সংখ্যার জন্যে নাকের বদলে নরুণের মত চমৎকার গল্প জোগাড় হ'য়ে গেছে কিন্তু তোমার। সুধু স্ত্রী চুরি নয়, ঔপন্যাসিকের "মডেল চুরি" বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার সরল প্রাণ-খোলা হাসির শব্দে ঘরখানি ভরাইয়া তুলিয়া পুনরায় কহিলেন—"কিন্তু এর জন্যে এতটুকু প্রশংসাও আমার পাওনা নয়—সবখানিই পাওনা ঐ শা,—খুড়ী, ভদ্র-মহিলার।" বলিয়া ক্ষম-প্রার্থনা অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ হাস্য-ফুল্লমুখে অণিমার বিনম্র নত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আদিত্যর ডিটেকটিভ বন্ধু যে কেন এ সংবাদ তাহাকে জানান্ নাই, সে-সম্বন্ধে ইচ্ছা করিয়াই প্রশ্ন করিলেন না। লজ্জিতমুখে হাত জোড় করিয়া আদিত্য কহিল,—"মাফ আপনিই করুন ব্রজেন্দ্রবাবু, আপনার কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই। দিদি, আপনার কাছেও আমি বড় অপরাধী। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রবাবুকে সুধু উপস্থিত বুদ্ধি নয়—পুরুষের শক্তি দিয়ে আজি আমাকে ও আপনাকে রক্ষে করেচেন।" সেই সম্ভাবিত বিপদের চিত্র কল্পনায় আনিয়া অণিমা ও নীলিমার চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া তুলিল। আদিত্যনাথের খাবার আনিবার ছুতায় বাহিরে চলিয়া গেলে আদিত্য স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল—"আমি স্বীকার কচ্চি অণি! ভালবাসা সুধু স্নায়ুর বিকার, কবি-কল্পনা নয়—সে-সত্য।" ব্রজেন্দ্রনাথ অণিমার লজ্জারক্ত নত মুখখানির দিকে সহাস্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"আমি বলি, ভাল-

বাসা মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিবাহিতের পবিত্র বন্ধন—আর লেখকের—বিজয়-মুকুট,—অণি চোক্ মুছে ফেল্—হারানিধি ফিরে পেয়েছি, কান্না কিসের ভাই!" মিষ্টান্নের থালা ও দুধের বাটী-হাতে নীলিমা ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে কহিলেন—"বাঙ্গালার সাহিত্য রথীকে মিষ্টান্ন দিয়ে আমার স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্চি। পান্নু জলের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে, তোর মেসোমশাইকে প্রণাম কর্। উঠে ব'সে খেতে পার্বে কি?—কাজ নেই—তুমি শুয়েই খাও।"

ইহার পর যাহা ঘটা সম্ভব, তাহা কল্পনা করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ পলায়নের পন্থা দেখিতে কহিলেন—অণি, আদিত্যবাবুকে আলিকাটা এক ডোজ খাইয়ে দিও। আমি একবার রান্নাঘরটায় তদারক ক'রে আসি।

ভর্তি

"পিপ্পলে—বাবু।"

হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া যে বারো তেরো বছরের ছেলেটিকে প্রতিদিন সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে দেখা যাইত, আজও সে তেমনি নিত্যকার নিয়মে খরিদ্দারের আশায় প্রত্যেক পথবাহী ও ট্রামযাত্রী ভদ্রলোকের উদ্দেশে হাতের খবরের কাগজখানি আগাইয়া ধরিতেছিল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যাইত, প্রতিদিনের মত আজ কিন্তু তাহার সে সতেজ উৎসাহভাব নাই। সেদিনকার বর্ষার আকাশের মতই তাহার চোখে মুখে ক্লান্তিজনিত কেমন একটা বিষন্নভাব মাখিয়াছিল। ভাদ্রের শেষাংশ—তবু বৃষ্টির এ বছর আর বিরাম নাই। আকাশভরা কেবল মেঘ আর জল। পথ কর্দ্দমাক্ত। কালীতলার মোড়ে জল জমিয়া সেই জল এখান অবধি ঠেলিয়া আসিয়াছিল, এখন কমিতে সুরু হইয়াছে। তবু পথে লোক-চলাচলের শেষ দেখা যাইতেছে না। ট্রামগাড়ী একখানির পর একখানি যেন মন্ত্রবলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘণ্টা বাজাইয়া গন্তব্য-পথে চলিয়া যাইতেছে। ছেলেটি অভ্যাসবশে একবার

করিয়া অগ্রসর হইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়ায়, ব্যাকুল উৎসুক-নেত্রে প্রত্যেক গাড়ীখানির ভিতর পর্য্যন্ত উঁকি দিয়া চাহিয়া দেখে, মুখে অভ্যস্ত বুলী—"বাবু—পিঙ্গলে" বলে, কিন্তু মন ও দৃষ্টি যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। আবার সে ফুটপাথের উপর গ্যাস্‌পোষ্টে হেলান দিয়া বিরসমুখে ক্লান্তভাবে দাঁড়ায়।

শুধু আজ নয়, প্রায় দুই বৎসর দিনের পর দিন, সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এই এক কাজে একই ভাবে সে কাটাইতেছে। শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস যখন তাহার জীর্ণ পঞ্জরের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিত, গায়ের আবরণ ময়লা বোম্বাই চাদরখানি বা তাহার হাতের খবরের কাগজের গরম খবরগুলি কিছুতেই যখন তাহার শীত নিবারণ করিতে পারিত না, তখন দুই কাঁধে হাত রাখিয়া শীত হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। শিশিরপাত, বর্ষার ধারা বা গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপ এই ছেলেটির শরীরে মনে বেদনা দিয়া তাহার কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারিত না।

ছেলেটির নাম ভর্ত্তু। গয়া-জেলায় তাহার দেশ,—দেশ সে কখন চক্ষেও দেখে নাই, এবং সংসারে আপন জন বলিতে এক বুড়া "দাদা" ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না। এই দাদাটিও তাহার খুব বেশী আপন নহে, বাপের দূর-সম্পর্কীয় খুড়া জ্যেঠা এমনি কেহ হইবে। অন্ধ বৃদ্ধ এখন তাহার ঘাড়ের

বোঝামাত্র। মার কথা তার মনেও পড়ে না। মা না থাকায়, তাহার মনে বিশেষ দুঃখবোধও ছিল না। সে দেখিয়াছে,—ছেলেদের মায়েরা তাহাদের যত্ন যেমনই করুক্, সেই সঙ্গে "এ কোর না ও কোর না ওখানে যেও না ওর সঙ্গে মিশো না"—এমনি সব নানা হাঙ্গামে তাহাদের দুঃখও দেয় খুব। সেবার হোলির দিন অমৃৎ কাদা মাখিয়া হোলি খেলিয়াছিল বলিয়া, তাহারি মা কাণ দুইটা ধরিয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিয়া গালে দুই চড় বসাইয়া দিল। পরে অবশ্য বেশম লাগাইয়া স্নান করাইয়া, সাফ কাপড়, গোলাপী রংকরা চাদর এবং জরী লাগান টুপী পরাইয়া, পয়সা, মিঠাই দিয়া তাহার রাগ ভাঙ্গাইয়া খেলিতে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু ভর্ত্তুর গায়ের কাদা তাহার গায়ে শুকাইয়া রহিল, তাহাকে কেহ সাফ করিয়াও দেয় নাই, চড়ও কসায় নাই। পথের ধারে ভর্ত্তু যখন দাড়াইয়া থাকে, সে দেখিতে পায়, কোন মা যদি ছেলের সঙ্গে চলিলেন, তবেই সর্ব্বনাশ!—"ঐ ট্রাম, ঐ গাড়ী, ঐ কাদা—নোংরা" আরও কত কি জঞ্জাল যে তাঁহাদের ননীর পুতুলদের জন্য পথে পথে জমান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভর্ত্তুর মা নাই, তাহার ও-সব কোন বালাই নাই, কাদা লাগিয়া লাগিয়া তাহার কাপড়খানির রং পর্য্যন্ত যে কাদার রং হইয়া গিয়াছে, সেজন্য কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না কেন সে তার কাপড়খানি ধোপার ঘরে দেয় নাই? সারাদিন না খাইয়া থাকিলেও কেহ কখন খাইতে ডাকে না, তখনই এক একবার তাহার মনে হয়, মা থাকিলে মন্দ

হইত না, খাবারের ভাবনাটা সেই ভাবিত,—ভর্ত্তৃকে আর ভাবিতে হইত না।

বাপের কথা একটু একটু যেন মনে পড়ে। সে তখন যেন খুব ছোট। বাপ তাহার তরকারির বাজরা মাথায় লইয়া প্রতিদিন হাটে যাইত। ছোট একখানি রাঙ্গা সাড়ীর কৌপীন পরিয়া, গলায় ঘুনসীতে একরাশ মাদুলী কবচ ঝুলাইয়া সে তাহাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটিতে সঙ্গীদের সহিত খেলা করিত, আর পথের পানেই চাহিয়া থাকিত। বাপ যখন খালি বাজরা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিত, প্রথমেই তাহার ছোট মুঠি ভরিয়া মুড়ী মুড়কি আর দুই গালে একরাশ চুমা দিয়া তাহাকে কোলে করিত। তার পর কবে কে জানে ভর্ত্তৃর চোখের উপর হইতে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা সে স্মৃতির দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের ভাঙ্গাচোরা ঘরখানিতে সে আর তার বুড়া দাদা। মনে পড়ে, এই অন্ধের হাত ধরিয়া পথে পথে কতদিন সে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে। একবার এই অন্ধকে বাঁচাইতে গিয়া, গাড়ীর চাকায় তাহার ডান পা খানির হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহাকে মেডিকেল-কলেজে লইয়া যায়। সেখানে সে ছয় সপ্তাহ ছিল। বাপের অস্পষ্ট স্মৃতি ছাড়া, তাহার জীবনের স্মরণীয় সেই একমাত্র ঘটনা! হাঁসপাতালে থাকিতে কেনই যে লোকে ভয় পায়, ভর্ত্তৃ ত তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না। খাসা ঘর, খাটিয়ার উপর গদি, মাথায় দিবার তাকিয়া, সাফ কাপড়, ঘড়ির কাঁটার মত সময়

মাপিয়া রুটি, দাল, ভাত, সবই খাইতে পায়, নিজেহাতে রাঁধিতে ত হয়ই না, কি রাঁধিব, চাউল কোথায়, কাঠ কোথায়, সে ভাবনাও ভাবিতে হয় না। যদি ভাঙ্গা হাড় যোড়া না লাগিত, পায়ের যন্ত্রণা সারিয়া না যাইত, ভর্ত্তু হয় ত মনে মনে খুসীই হইত। তবু সেখানে সব সুখ থাকিলেও একটা মস্ত দুঃখ ছিল—সেই বুড়া দাদার ভাবনা। সে বেচারা অন্ধ নিরুপায়! কে তাহাকে দুই-মুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া দিতেছে—কে জানে? সে চাউলও ত আবার তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত নাই, সেও যে "সুরদাসকো দয়া কর দাতা" বলিয়া বার্দ্ধক্যজীর্ণ অন্ধের হাত ধরিয়া পদে পদে বিপদসঙ্কুল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া তাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। তাই হাঁসপাতালের ঔষধ পথ্য সেবায় কৃতজ্ঞচিত্ত ভর্ত্তু সম্পূর্ণরূপে এত সুখের মধ্যেও শান্তি পাইত না। মনটি তাহার সেই চিরদিনের অসংস্কৃত অমার্জ্জিত কুঁড়েখানির জন্যই ছট্‌ফট্ করিতে থাকিত।

সেদিন—সেদিন সে "মেটিয়া কালিজ" হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসে, সেদিন সকালবেলা কতকগুলি বাঙ্গালী খৃষ্টান্ মহিলা তাহাদের ওয়ার্ড পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন—কি সুন্দর তিনি! আর, কি মিষ্ট তাঁর কথাগুলি! সকলের সঙ্গেই তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে কথা বলিতেছিলেন। ভর্ত্তুর পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিয়াছিলেন, "তবিয়ৎ কেইসা বাচ্চা?" ভর্ত্তু সসম্ভ্রমে জানাইয়াছিল, সে সারিয়া গিয়াছে এবং আজই সে "আস্পাতাল" হইতে "ছুটি" পাইবে। শুনিয়া হাসিমুখে তিনি

বলিয়াছিলেন—"বহুৎ খুস্ হোঙ্গে ! লেকেন্ ইয়াদ রাখ্না লেড়কে, বদ্মাসী দিল্দাগী বিলকুল ছোড় দেনা। ইমান্‌কো সবসে বড় সমঝনা—তব্ না আস্লী আদমী বন্ যাওগে।"

ভর্ত্তৃ মাথা নীচু করিয়া কেবল একটুখানি হাসিয়াছিল। কথার উত্তর না দিলেও, কথাগুলি যে তাহার প্রাণের ভিতর পৌঁছিয়াছে, সে তাহার সকৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টিতেই ব্যক্ত হইতেছিল।

নারীদল চলিয়া গেলেও ভর্ত্তৃ ব্যাকুল-চোখে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মনের ভিতরটা কি এক অস্পষ্ট অব্যক্ত সুখের ব্যথায় যেন পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, সেই মিষ্টভাষিণী প্রিয়দর্শনা নারীর পায়ের তলায় পড়িয়া সে একবার প্রাণ ভরিয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া লয়। একবার চীৎকার করিয়া বলে—এমন মিষ্ট কথা কেহ কখনও তাহার সহিত কহে নাই, সে আজ ধন্য হইয়াছে। কিন্তু চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ দীন বালকের মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে দিল না। গরীব ভিখারী সে, "হট যাও" "সরিয়া দাঁড়া" যাহার প্রাপ্য,—হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিবার বাতুলতার মত রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিবার সাহস সে কেমন করিয়া করিবে? পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি এক গণ্ডুষ জল পানে তৃপ্ত না হইয়া যেমন দ্বিগুণ পিপাসায় কাতর হয়, ভর্ত্তৃর চিরদিনের স্নেহবঞ্চিত পিপাসী চিত্ত এই বিন্দুমাত্র স্নেহের স্বাদ অনুভবে তেমনি অতৃপ্ত স্নেহতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

হাঁসপাতালের বাহিরে আবার সেই অবাধ যাত্রা! সকাল

হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া ভিক্ষান্বেষণ, বুড়া দাদা বাতের ব্যথায় আর পথ চলিতে পারে না। অন্ধকে যাহারা দয়া করিতেন, বালককে তাঁহারা দয়া করিয়া ভিক্ষা দিতে চাহেন না। তাহার কারণ যে, দাতার মনে দয়ার অভাব তাহা নহে। ভেজালের বাজারে আসল নকল চিনিতে পাছে ভুল করিয়া ঠকিয়া যান, সেই ভয়ই বোধ করি বেশী; পুরাণ বন্ধু কিষণ আশ্বাস দিয়া কহিল—"ভয় কি, দুটা পেট বইত নয়, পথ থেকেই কুড়িয়ে বাড়িয়ে চালিয়ে নিবি। আমার সঙ্গে কাযে লাগ্, দেখবি কোন দুঃখু থাকবে না। বুদ্ধি থাকলে আবার রোজগারের ভাবনা—হুঁ!"

উপাৰ্জ্জনের তালিকা শুনিয়া ভর্ত্তৃ নিরাশ হইল। চুরি—ছিঃ! চুরি সে করিবে না। কিষণ তাড়া দিয়া কহিল—"ওঃ কি আমার যুধিষ্ঠির রে! রাস্তায় পড়ে থাকলে কুড়িয়ে নিতে যদি দোষ না থাকে, তুলে নিলেই কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে শুনি? কাঁচি দিয়ে কুচ ক'রে পকেট্‌টি কেটে নিলাম, ভিড়ের ভেতর অন্য-মনস্ক পেলে, হ'লগে পকেট্‌থেকে আস্তে আস্তে ঘড়িটা, মনিব্যাগটা, হ'লগে রুমালখানা কি চশমাখানা তুলে নিলাম। এই বই ত না! মেহনৎও বেশী নেই, পেটও অনায়াসে ভরবে।" ভর্ত্তৃ কিন্তু বন্ধুর এ অমূল্য উপদেশ ও অমোঘ প্রলোভন জয় করিল। না, সে চোর গাঁটকাটা হইবে না। তাহাতে না খাইয়া যদি তাহাকে মরিয়া যাইতে হয়, সোভি আচ্ছা। তাহার মন বলিতেছিল, আবার সেই সুন্দরী দয়াবতী বাঙ্গালী মেমের সহিত দেখা হইবে। তখন মুখ

তুলিয়া উচু মাথায় দাঁড়াইয়া সে বলিতে পারিবে—তাঁহার কথা রাখিয়াছে, পেটের দায়ে সে চুরী করে নাই ; সে সৎপথে থাকিয়া মানুষ হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

কিছুদিন অদ্ধাশন অনশনে থাকিয়া, ভিক্ষালব্ধ পয়সার কিছু জমাইয়া, অনেক চেষ্টায় সে আজ দুই বৎসর এই সংবাদপত্র বিক্রয়ের কাজটি জোগাড় করিয়াছে। চেষ্টা রাখিলে হয়ত ইহার চেয়ে ভাল কাজও কিছু জুটিতে পারিত। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, আবার তাঁহাকে সে দেখিতে পাইবে আর, তাঁহার দেখা পাইবার সব চেয়ে সহজ উপায় তাহার পক্ষে এইটাই। তিনি কোথায় থাকেন ভর্ত্তু জানে না, সুধু শুনিয়াছিল, সেদিন সঙ্গিনীকে তিনি বলিতেছিলেন, "হ্যারিসন রোডের ট্রামে ওঠাই আমার সুবিধা।" সেদিনকার তাঁহার সেই কথাগুলি ভর্ত্তুর এখন জপমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, প্রয়োজন অপ্রয়োজনেও সে এই পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। যখন কাগজ বিক্রীর সময় নয়, তখনও সে অকারণে পথের ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। সময়াভাবে কতদিন স্নান হয় না, আহার হয় না! রাত্রে ঘুমাইয়াও সে শান্তি পায় না, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে।

কিন্তু সেদিন দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর তাহার নিরাশা-ক্ষুব্ধ চিত্ত সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে আর পারে না। এমন করিয়া দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকা—এ যে আর সহ্য হয় না। নিরাশার অন্ধকার যতই জমাট্ বাঁধিয়া উঠে, বক্ষঃপঞ্জর ততই বেদনায় টনটন্ করিতে থাকে। সকালবেলাকার লবণ-সংযুক্ত পান্তাভাত রুটি এত দুঃখের মধ্যেও কেমন করিয়া যে কখন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। এই লক্ষী-

ছাড়া পেট যদি না থাকিত, সে এই কাগজ বিক্রীর দায় এড়াইয়া নিজের কুঁড়ে-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মেজের উপর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। সেখানে সে চীৎকার করিয়া কাঁদুক, মাটীতে মাথা কুটিয়া রক্ত বহাক্, যা খুসী করুক্—কেহ কিছু বলিবে না, কোন খবর লইবে না। তাহার অন্ধ সঙ্গী দাদাটিকেও সে আজ দুইদিন জন্মের মত বিদায় দিয়াছে। পোড়া পেটের ভাবনা না থাকিলে আজ সে মুক্ত—সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত।

"পিঙ্গ্লে,—বাবু"—ভর্ত্তৃ, তাহার অভ্যস্ত বুলি মুখে উচ্চারণ করিলেও মনে মনে বলিতেছিল—"এই শেষ! তিনি আসেন আজ ভাল. না আসেন আমার কাগজ বিক্রীর আজ পিণ্ডদান।"

ভর্ত্তৃর মন চিন্তাসাগরের অতলে তলাইয়া গেলেও, দৃষ্টি তাহার পথবাহীদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কত রকমের কত লোক পথ দিয়া আসিতেছে যাইতেছে। ঐ একজন কলেজের ছেলে, বোধ হয় বই পড়িতে পড়িতেই পথ চলিতেছে। এখনি যে মোটর বা গাড়ীর তলায় দুখানা হবেন, সে হুঁস্ নাই। ভর্ত্তৃ অগ্রসর হইয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিবার জন্য কহিল—"পিঙ্গলে"। ছেলেটি তাহার পানে না চাহিয়াই মাথা নাড়িয়া জানাইল, অনাবশ্যক। তা হউক, ভর্ত্তৃর কার্য্য-সিদ্ধ হইয়াছে ত। ছেলেটি বই মুড়িয়া পথের পানে চাহিয়া চলিতেছে, সেই ঢের।

দুটি ছেলের হাত ধরিয়া একজন ঝি আসিতেছিল। পাছে ছেলে দুটি কাদা জল মাখে, তাই তাহাদের দুখানা হাত ধরিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া ফুটপাথের উপর তুলিবার হ্যাঁচ্‌কানিতে ছেলে দুটি চীৎকার করিতেছিল। ভর্ত্তৃ ব্যর্থরোষে ঝিয়ের পানে চাহিয়া দেখিল, প্রতিবাদের সাহস হইল না। ঐ একজন স্ত্রীলোক

আসিতেছেন না? ঘুরাইয়া শাড়ী-পরা, পায়ে জুতা, হাতে ছাতি—তিনিই কি? তেমনই সুন্দর মুখ, তেমনই চলিবার ধরণ—ঐ যে বা-হাতে ঘড়ী-পরা, নিশ্চয়ই তিনি—আর কেউ নন্। “জয় হনুমানজি!” ভর্ত্তৃর এতদিনের সাধনা, এত দুঃখ পাওয়া, তবে সার্থক হইয়াছে। সে তবে সত্যই আজ মাথা তুলিয়া উঁহার পানে চাহিয়া বলিতে পারিবে, বড় দুঃখে পড়িয়াও সে অন্যায় কর্ম্ম করে নাই, না খাইয়া থাকিয়াছে, তবু চুরি করে নাই। জয় কালীমাঈ!

রেশমী শাড়ীর প্রান্তদেশ বামহস্তে ধরিয়া, কাদায় জুতা বাচাইয়া মহিলাটি যথেষ্ট সন্তর্পণে পথ চলিতেছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার ট্রামের পথের উপর। ভর্ত্তৃ আনন্দে হাতের কাগজগুলির কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া, সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াই তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেল। “আমি—আমি—সেই যে দেখেছিলেন আমাকে” আনন্দের আতিশয্যে তাহার রুদ্ধকণ্ঠে আর স্বর বাহির হইল না।

রমণী একবারে ঘোর অবজ্ঞাভরে তাহার পানে চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন। হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে পুনরায় ট্রামের রাস্তার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। ভর্ত্তৃকে তখনও স্থিরভাবে কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন—“ইউ ভাগো ভাগো হিঁয়াসে।”

“শুনেন মা, আমি ভিকিরি নই, এই দেখেন না আমার কাগজ পড়ে রয়েছে—আমি—আমি—সেই ছোট ছেলে হাঁসপাতালে—”

রমণী তীব্রস্বরে বাধা দিয়া কহিলেন—“বস্—বস্ কর, চলা যাও আবি। পয়সা নেহি মিলেগা।”

শব্দ করিয়া ট্রাম আসিয়া পড়িল। রমণী দ্রুতপদে ফার্ষ্ট ক্লাসে

উঠিয়া বস্ত্রাদি সাবধানে যথাবিন্যস্ত করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ছাতাটি মুড়িয়া পাশে রাখিয়া রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হাওয়া খাইতে লাগিলেন। ঘণ্টা দিয়া ট্রাম চলিতে সুরু করিল। ভর্ত্তৃ স্তম্ভিত অভিভূতভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃষ্টিধারার সহিত মাথার উপর কাহার শীতল করস্পর্শে সচকিত হইয়া সে মুখ ফিরাইল। পাড়ার নিষ্কর্ম্মা কনসার্টপার্টি দলের সভ্য নিতাই, গঙ্গাস্নান সারিয়া ভিজা কাপড় পরিয়াই বাড়ী ফিরিতেছিল। হাতে গামছায় কতকগুলি পূজোপকরণ। নিতাই সেই স্নেহ কোমলস্বরে কহিল—"ভর্ত্তৃ যে. এমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন রে? মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি হয়ে গেছে যে—খাস্‌নি বুঝি কিছু? আজ জন্মাষ্টমির পূজো হ'চ্ছে বাড়ীতে, ঠাকুরের প্রসাদ পাবি, চল্। খাবিনি বই কি, তোর ঘাড় খাবে—চল্। কাগজগুলো ফেলে দিয়েছিলি কেন রে? দেখ্‌ত, জলে কাদায় একবারে মাটী হ'য়ে গেছে। এই যে আমি কুড়িয়ে এনেচি। নে ধর্—আর আমার সঙ্গে আয়।"

মেঘে যিনি বজ্র বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে শীতল জলধারাও দিয়াছেন। শূন্যকে পূর্ণ করাই যে তাঁহার কাজ।

সমাপ্ত

আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালা

মূল্যবান সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৸৴০ লাগিবে। একত্রে ১০ দশখানি পুস্তক লইলে, ডাকব্যয় লাগে না। মোট ৫৲০ ও ভিঃ পিঃ ফি ৵০ পড়ে।

১। **অভাগী** (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
২। **ধর্ম্মপাল** (৩য় সং) শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, এম-এ
৩। **পল্লীসমাজ** (৯ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ
৫। **বিবাহ-বিপ্লব** (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
৬। **চিত্রালী** (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
৮। **শাশ্বত ভিখারী** (২য় সং)-শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ
৯। **বড়বাড়ী** (৯ম সং) —রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
১০। **অরক্ষণীয়া** (৭ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (৩য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
১৩। **রূপের বালাই** (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। **লাইকা** (২য় সং)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
১৬। **আলেয়া** (২য় সং)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
১৭। **বেগম সমরু** (২য় সং)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (৪র্থ সং)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
২০। হালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনিন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
২১। মধুপর্ক (২য় সং)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ
২৩। সুখের ঘর (৪র্থ সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম-এ
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনবালা দেবী
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীমতী সরলা দেবী
৩১। নীলমাণিক (২য় সং)-রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট
৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
৩৩। মায়ের প্রসাদ (২য় সং)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
৩৭। ব্রাহ্মণ পরিবার (২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
৩৮। পথে বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সি-আই-ই
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৪র্থ সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম-এ
৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪৩। বাণী—৺অনিত্যকৃষ্ণ বসু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা